০ ১ ২ ০ ১ ২
I নর্সা না না। দা -া। পা -দা I পা মা গা। ঋা -সা। সা -া II II
জ০ য় জ ন ০ নি ০ জ ন ম ভূ ০ মি ০

দু'টি গুম্ফ { } বন্ধনীর আর দু'টি বক্র [ ] বন্ধনীর মধ্যে স্থাপিত পংক্তিক'টী, স্বরলিপি অনুযায়ী বিভিন্ন ঘাটে গেয়। প্রথম বার গুম্ফ-বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সুরে, আর দ্বিতীয় বার বক্র-বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সুরে গাইতে হ'বে। কোন ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলনীর সামাজিক অধিবেশনে, মিলিতকণ্ঠে বালকবালিকাগণ এ গানখানি গাইলে, শ্রুতি-মধুর হ'বে বলে আমার বিশ্বাস। —লেখিকা।

সোণার হার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মধুরাও যখন মুদ্‌কল ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। সম্মুখে কৃষ্ণমৃত্তিকাচ্ছাদিত কঠিন প্রান্তর ;—যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কাননের শ্যামল শোভা দেখা যায় না।—কোন কোন স্থানে ছোট ছোট ক্ষুদ্র প্রস্তর-স্তূপ,কোথাও বা দুই একটি কাঁঠাল বা আম্র-বৃক্ষ। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আকাশে কিরণ দিতেছিলেন, কিন্তু বৎসরের মধ্যভাগ বলিয়া উত্তাপ অসহনীয় নহে। মধুরাও একবার সতৃষ্ণনেত্রে পশ্চাতে চাহিয়া আপন-মনে অশ্ব-চালনা করিতে লাগিলেন। মুদ্‌কলের প্রান্তদেশে তখনও কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়াইয়া। দূরে একটি আম্রবৃক্ষের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া কুলবর্গের সেই সম্রান্ত সৈনিক বিজয়নগর-সেনার প্রস্থান নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবা সহচরকে বলিলেন, "আজিম! তুমি এখনি এই অঙ্গুরীয়ক লইয়া রায়চুড়ে যাও। খাঁ-সাহেবকে বলিবে, তিনি যেন মুদ্‌কলে পঞ্চশত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। আজ হইতে তৃতীয় দিনে যেন তাহারা এখানে উপস্থিত হয়। বাক্যব্যয় করিও না, এখনি যাও। তুমি না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত শিকার বন্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও।" অনুচর কুর্ণীশ করিয়া চলিয়া গেল। চিন্তাকুলহৃদয়ে যুবকও আপনার শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রীতা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সৈনিকের কথাই ভাবিতেছিল ; ভাবিতেছিল, মানব এত সুন্দর হইতে পারে! সেই এক মুহুর্ত্তের মধ্যে যুবার মূর্ত্তি তাহার অন্তরপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। গৃহকর্ম্মে মন লাগিতেছিল না। স্নেহের গোবৎসগুলি ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করিতেছিল—আজ ত একটি পরিচিত হস্তের কোমল স্পর্শ তাহাদের নিকট পৌঁছায় নাই! প্রীতার মাতা একবার তাহাদিগের নিকট গেলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, প্রভাতের ঘটনা কন্যার মন বিচলিত করিয়া দিয়াছে, তাই ইহাদের এত অনাদর। কৃষক

তিস্মা বাহিরে গ্রামবাসিগণের সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত।

পরদিন প্রীতার বাহ্য স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিল, কিন্তু অন্তর পূর্ব্ববৎ অস্থির। সে কার্য্য করিতে করিতে এক একবার দ্বারপথে দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করিতেছিল; আশা—যদি সে মোহন-মূর্ত্তি কার্য্যব্যপদেশে কুটীর-সম্মুখ দিয়া গমন করে। তাহাকে কে যেন বলিতেছিল, "আসিবে, সে এখনি আসিবে!" কিন্তু কই! সে ত আসিল না। পরদিনও এইরূপে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে তিস্মা একটি পুরুষের সহিত গৃহে প্রবেশ করিল;—বলিল "প্রীতা, জল আন, বিজয়নগরের রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য আসিয়াছেন,—আজ বড়ই সৌভাগ্য! চরণ ধুইয়া দাও।" প্রীতা জল আনিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ ব্যগ্রতা ছিলনা। সে ভাবিতেছিল, 'বিজয়নগর হইতে এ ব্রাহ্মণ এলেন কেন? আবার কি সেই কথা উঠিবে? কি বিড়ম্বনা!' ওষ্ঠ দৃঢ় নিবদ্ধ করিয়া সে পিতার আদেশ পালন করিতে গেল। সহসা লোকাচার্য্য তিস্মাকে বলিলেন, "বাহিরে কিসের গোলযোগ, তিস্মা?" কৃষকের মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। সে জানিত না যে গ্রামের প্রান্তরে হিন্দুমুসলমানে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে, আর সে যুদ্ধের কারণ তাহার কন্যা। সুতরাং সে বলিল, "গ্রামের সকলে আমোদ করিতেছে।" প্রীতা একটি পাত্রে জল লইয়া আসিল। ক্ষীণ দীপালোকে ব্রাহ্মণ প্রীতাকে দেখিলেন এবং পদধৌত না করিয়া তিস্মাকে আলোকটি নিকটে আনিতে বলিলেন। প্রীতা তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাতখানি লইয়া প্রদীপের নিকট ধরিলেন, কিয়ৎক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করার পর বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! রাজপুত্রবধূ—!" মুখের কথা শেষ হইল না। অনতিদূরে গ্রামবাসীর ভয়বিহ্বল আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। তিস্মা বলিয়া উঠিল, "শত্রু আসিয়াছে। ঠাকুর কি হইল!" লোকাচার্য্য বলিলেন, "পারিলাম না, সব ব্যর্থ হইল। তিস্মা! ভীত হইও না। বনের মধ্যে সেই মন্দির আছে, সেই খানে গিয়া আশ্রয় লও, কেহ জানিতে পারিবে না। প্রীতা পিতার পার্শ্বে আসিয়া কহিল, "আর আপনি?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার জন্য ভাবিও না, মা! যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বিজয়-নগরের সৈন্য; তোমার জন্যই আসিয়াছে। বিলম্ব করিও না, যাও!" কৃষক স্ত্রী-কন্যা লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল।

লোকাচার্য্য বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শ্রান্ত চরণ অসুস্থ অবশ দেহকে আর বহন করিতে চাহিতেছিল না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি দ্বারপথে আসিতেই দেখিলেন, দীর্ঘকায় এক যোদ্ধা অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে। শুক্লা নবমীর মলিন চন্দ্রকর তাঁহার ও তাঁহার অনুচর দুইটীর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। মূর্ত্তি ভাল চেনা যায় না; কিন্তু শীঘ্রই সন্দেহ দূর হইল। অশ্বারোহী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি এখানে? সে কৃষক কোথায়?" লোকাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! তাহারা চলিয়া গিয়াছে, অন্বেষণ অনর্থক। সে কন্যাকে—।" দেবরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আপনিই তাহাদের পলায়নের পরামর্শ দিয়াছেন।

আমরা তাহাদের ধরিব। আর আপনাকে বলি, আপনি বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। ইহার শাস্তি বড় সাঙ্ঘাতিক। কিন্তু আপনাদের বংশের নিকট আমরা ঋণী। আপনার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, শাস্তি—নির্ব্বাসন। বিজয়নগর-সাম্রাজ্যে আপনার আর স্থান হইবে না।"

দেবরায় সেখানে আর অপেক্ষা করিলেন না। গ্রাম অধিবাসিশূন্য। দূরে তাঁহার অশ্বারোহী মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিতেছে। মুসলমান সৈন্য সংখ্যায় কম ছিল। বিজয়নগরের সৈন্য পথভ্রান্ত হইলেও সেই জন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত অরণ্যের মধ্য দিয়া দেবরায় অশ্ব চালনা করিতেছিলেন। পার্শ্বচর দুইজন দূরে ছিল। তিনি সহসা দেখিলেন, তাঁহার পথরোধ করিয়া পার্শ্ব হইতে একজন অশ্বারোহী শত্রু আসিলেন। তরবারি উত্তোলন করিয়া মুসলমান যোদ্ধা দেবরায়কে আক্রমণ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মুসলমান বীরের শির লক্ষ্য করিয়া দেবরায় অস্ত্র-চালনা করিলেন। সে আঘাত লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেদ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া গেল; তিনি অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন। শত্রুর প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপের সময় বেগ-সংবরণ করিতে না পারিয়া দেবরায়ও পতিত হইলেন। তিনি সামান্যরূপ আহত হইয়াছিলেন। অনুচরদুইজন এমন সময়ে আসিয়া পড়িল। তাহাদের সাহায্যে তিনি পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠিয়া গ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মুসলমান যোদ্ধার শরীর অস্ত্র-বিদ্ধ হয় নাই, তবে মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া তিনি চেতনা হারাইয়াছিলেন। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিলেন শিক্ষিত অশ্ব নিকটেই অবস্থান করিতেছে। স্থানটি উন্মুক্ত—বৃক্ষের ভাগ কম।—অশ্বের নিকটে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি ভগ্ন গৃহের কয়েক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে; অদূরে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, একটি অট্টালিকা। তিনি অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। শিরস্ত্রাণ ব্যবহারোপযোগী ছিল না, সুতরাং মস্তক অনাবৃত রহিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন সেটি অট্টালিকা নয়, একটী ভগ্ন মন্দির।

মন্দিরে প্রীতা ও তাহার মাতাপিতা আশ্রয় লইয়াছিল। সেই স্থান হইতেই তাহারা দ্বন্দ্বযুদ্ধের শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল এবং দেবরায় ও তাহার সঙ্গিগণের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারিল যে, বিজয়-নগরের সৈনিকগণ আহত শত্রুকে ভূপৃষ্ঠশায়ী রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহারা আরও জানিল যে, ভূপতিত যোদ্ধাই তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। যখন তাহারা বুঝিল যে, বিজয়-নগরের সৈন্য-কয়জন অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা ভাবিল, এইবার বাহির হইবে; কিন্তু দেখিল সৈনিক আপনিই আসিলেন ও ভগ্ন সোপানে ভর দিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, সুতরাং তথায় অল্প চন্দ্রালোক ছিল। প্রীতা দূর হইতেই তাহার পরম বাঞ্ছিত কামাধনকে চিনিতে পারিয়াছিল। প্রণয়িনীর চক্ষু মিথ্যা বলে না। প্রীতা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। তিমা অস্ফুটস্বরে

প্রীতাকে কহিল, "মা! এই সৈনিকের হাতে তোকে জন্মের মত দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে চাই। তোর কি ইহাতে আপত্তি আছে? এ সৈনিক ত' আর রাজা নয়—আমাদেরই মত একজন সামান্য লোক।" প্রীতা কোন উত্তর করিল না। তিস্মা মন্দির-দ্বারে আসিল। শব্দ শুনিয়া সৈনিক পিছনে চাহিলেন। অভ্যস্ত হস্ত অসি স্পর্শ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু তিস্মার পরিচিত কণ্ঠস্বরে ও মূর্ত্তি দেখিয়া হস্ত কটিদেশে আসিয়া থামিয়া গেল। তিস্মা বলিল, "সৈনিক! তুমি আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ, আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, জানি না। তোমার হাতে আমার এই মেয়েকে জন্মের মত দিতে ইচ্ছা করি; ইহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই।"

প্রীতা তাহার মাতার সহিত পশ্চাতে ছিল। তাহার মনে হইতেছিল, পৃথিবীর যত আলো সেই তরুণ বদনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকের বৃক্ষশ্রেণীর গাঢ় কালিমার মধ্যে সে মুখখানি সন্ধ্যা-তারার মত জল্ জল্ করিতেছিল। প্রীতা দেখিল, পিতার কথা শুনিয়া যুবক উঠিলেন, বলিলেন, "এ আমার সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আপনার কন্যা আমার স্ত্রী হইতে পারেন না!" তিস্মা বলিল, "কেন যুবক! তুমি একজন সৈনিক, আমি কৃষক, ইহাতে তোমার বংশ-মর্য্যাদার হানি হইবে না। আর তুমি স্বয়ং রাজপুত্র হইলে আমার মেয়ে তোমাকে বিবাহ করিত না। —ওঃ বুঝিয়াছি, তুমি কি বিবাহিত?" যুবক বলিলেন, "আমি বিবাহিত নহি, আমি মহামান্য কুলবর্গ-সুলতানের একজন মুসলমান কর্ম্মচারী।" তিস্মা স্তব্ধ হইয়া থাকিল; পরে কহিল, "উঁহাকে আমি এখন রক্ষা করিতে পারি না। বিজয়-নগরের সম্প্রদায় আবার কি বিপদ ঘটায় জানি না। আর আমি বুঝিয়াছি, আমার মেয়েরও অমত নাই।" প্রীতা সঙ্কুচিত লতার ন্যায় সরিয়া গেল। যুবক তাহা লক্ষ্য করিলেন ও ক্ষণকালপরে বলিলেন, "বিজয়নগরের বাহিনী আমাদের রাজ্যে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবে না। আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়াছে বটে, কিন্তু রায়চুড় হইতে নূতন সৈন্য আসিলে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন দুষ্কর হইবে, সেই জন্য তাহারা এখনি প্রস্থান করিবে। আপনারা এখন নিরাপদ। ইচ্ছা করিলে কিছুক্ষণ পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কৃষক যুবকের উদারতা বুঝিতে পারিল না; ভাবিল এ অনিচ্ছা কিন্তু অনিচ্ছার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। মন্দির-মধ্যে যখন সে আপন সংকল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন দেখিয়াছিল কন্যার আপত্তি নাই। তাহার পত্নী এ সব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে না। যুবকের ধর্ম্মের কথা শুনিয়া কৃষক প্রথমে বিচলিত হইয়াছিল কিন্তু প্রীতার ইচ্ছা বুঝিয়া সংকল্প দৃঢ় হইল। যুবকের অনিচ্ছা দেখিয়া সে কহিল, "সৈনিক! যদি আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাও, তাহা হইলে জানিও আমাদের কোন অনিচ্ছা নাই।" যুবক কহিলেন, "আমার ইচ্ছার কথা খোদা জানেন। আপনার কতদূর ইচ্ছা তাহাই দেখিতেছিলাম।" তিস্মা কহিল, "তোমাদের ঈশ্বরের নাম করিয়া শপথ কর যে ইহাকে ধর্ম্মপত্নী করিবে।" যুবক তাহাই করিলেন। তিস্মা তখন কম্পিত লজ্জাবনতমুখী প্রীতার অবশদেহ যুবকের হস্তে

তুলিয়া দিল। যুবক বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে চলুন্।" তিম্মা বলিল, "তুমি কোথা যাইবে?" যুবক উত্তর দিলেন, "আমি কুলবর্গ অভিমুখে যাইব। অল্পদূর অগ্রসর হইলেই আপনাদের জন্য বাহকের বন্দোবস্ত করিতে পারিব।" কৃষক বলিল, "তোমরা চলিয়া যাও। আমরা এখানে থাকিব। যদি বাহক পাও এখানে পাঠাইয়া দিও।" যুবক প্রীতাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন মন্দির-দ্বারে এই অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইতেছিল, তখন গ্রামের প্রান্তরের উপর দৃশ্য অন্যরূপ। মধুরাও শরীরে আঘাত পাইয়া রণক্ষেত্রে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দেবরায়ের আদেশে কতিপয় সৈনিক তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া প্রীতার জন্য আনীত পার্শ্বস্থ শিবিকায় তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিল। দেবরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আঘাত গুরুতর নহে। শুশ্রূষার আদেশ দিয়া তিনি তিম্মার কুটীরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। মধুরাও শিবিকা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন দূরে এক ব্যক্তি প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় একটি প্রস্তর-স্তূপের উপর বসিয়া। মূর্ত্তিটি অবশেষে তাঁহারই নিকট আসিতে লাগিল। স্তিমিত চন্দ্রালোকে প্রথমে মধুরাও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, তিনি পুরোহিত লোকাচার্য্য। হস্তের ইঙ্গিতে প্রধান নায়ক পার্শ্বচরগণকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একস্থানে কতিপয় মরণাহত অশ্বের শেষ চিৎকার আহত আরোহীর আর্ত্তনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া রজনীকে বীভৎস করিয়া তুলিতেছিল। নৈশ সমীরণ যন্ত্রণাভারে পীড়িত হইয়া যেন তাহার নিত্য-কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিল।

লোকাচার্য্য প্রথমেই কথা কহিলেন; বলিলেন, "মধুরাও! আমি যাইতেছি। মহারাজাধিরাজের আজ্ঞায় আমার নির্ব্বাসন হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার সন্তানগণের সহিত সুখী হও। মারাপ্পা আসিলে বলিও, আমি দেবরায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই। তাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সে যেন সুখী হয়।" মধুরাও ব্রাহ্মণের পদ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "বিজয়-নগরের রাজলক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ভগবন্! আশীর্ব্বাদ করুন্, সাম্রাজ্যের যেন কোন বিপদ্ না ঘটে।" লোকাচার্য্য কহিলেন, "বিরূপাক্ষ-দেবের নিকট প্রার্থনা করি, সাম্রাজ্য-গৌরব যেন অটুট থাকে। কিন্তু মধুরাও, আমি জাগ্রৎ অবস্থায় বিভীষিকা দেখিয়াছি।" লোকা-চার্য্যের নেত্রে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা! ব্রাহ্ম-ণের স্বর শুনিয়া মধুরায়ের বোধ হইতেছিল যেন নির্জ্জন পর্ব্বতের গভীরতম কন্দর বায়ুর আঘাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেন চতুর্দ্দিক্ বিপুল হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে! সে হাহাকার পৃথিবীর নহে—তাহা দানব-শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় অশ্রান্ত বেদনায় ব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত করিতেছে! লোকাচার্য্য দূর প্রস্তর-স্তূপের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "আমি ঐখানে বসিয়াছিলাম। চারিধার হইতে মরণ-চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। মনে হইল, চন্দ্রের দীপ্তি পিঙ্গল হইয়া আসিল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশে তারা নাই। ক্রমে পশ্চিম-গগনে মহাকালের রক্তচক্ষুর ন্যায় চন্দ্র লোহিত

বর্ণ ধারণ করিল। সে তখন নবমীর খণ্ড-চন্দ্র নহে, উজ্জ্বল রক্ত-গোলোক। তাহা হইতে যে আলোক নির্গত হইতেছিল, তাহা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় প্রখর। সে আলোকে সমস্ত প্রান্তর উদ্ভাসিত। দেখিলাম, বিজয়-নগরের সৈন্যব্যূহ কাতারে কাতারে চলিয়াছে। রায়-চূড়ের উপর বিজয়নগরের পতাকা উড়িল, আবার তাহা লুণ্ঠিত হইয়া ভূতলে পড়িল। তারপর দেখিলাম, বিজয়নগরের সম্রাটের শ্রেণী, সৈন্যের শ্রেণী, অশ্বের শ্রেণী, হস্তীর শ্রেণী! জ্যোতিতে নয়ন অন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ বধির করিয়া কত শত বজ্রাগ্নিশিখা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।" এইস্থানে ব্রাহ্মণ নীরব হইলেন।

মধুরাও নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন; নয়ন তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যুক্তহস্তে আপন বদন আবৃত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল কেহই কথা কহিলেন না। পার্শ্ব হইতে একজন হতভাগ্য কাতর ধ্বনি করিল;—তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে-ছিল। দূরে কতকগুলি সেনার হর্ষকোলাহল শুনা গেল।

লোকাচার্য্য আবার বলিতে লাগিলেন, "মধুরাও! তারপর যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর ভুলিব না। বিশাল প্রান্তর—সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। মনে হইল, পৃথিবীর যত সৈন্য সেই স্থানে একত্র হইয়াছে। বিজয়-নগরের সৈন্য দেখিলাম। তাহাদের বেশভূষা রণসজ্জা দেখিয়া মনে হইল, বিন্ধ্যগিরি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেও তাহারা উন্মুক্ত অস্ত্রশ্রেণীর সাহায্যে সে পতন রোধ করিতে পারে। মধ্যভাগে বিচিত্র লোহিত চন্দ্রাতপ মণিমুক্তায় ঝলমল্ করিতেছে। চন্দ্রাতপ-নিম্নে বিজয়-নগরের সম্রাট্, পার্শ্বে রত্নখচিত শিবিকা; মুহূর্ত্তমধ্যে সব পরিবর্ত্তিত হইল। একবার দেখিলাম, এই শিবিকা আর তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; সে-মূর্ত্তি তোমার, দূর হইতে ভাল চিনিতে পারিতেছিলাম না। পরক্ষণেই সব ধূমে ঢাকিয়া গেল—আকাশভেদী গর্জ্জন ও রণকোলাহল শুনিলাম। কি পৈশাচিক চীৎকার! মধুরাও! আমার কর্ণে এখনো তাহা ধ্বনিত হইতেছে!—অন্ধকার চলিয়া গেল; দেখিলাম, সম্রাটের শোণিতাক্ত মস্তক বল্লমের উপর স্থাপিত। আমাদের বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন বিতাড়িত!—এ বিশাল সাম্রাজ্য জীর্ণ গলিত পত্রের ন্যায় প্রলয়-ঝঞ্ঝাবাতে উড়িয়া গেল।"

মধুরাও শিহরিয়া উঠিলেন। ওষ্ঠ হইতে আপনার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিল, "সে শির কাহার? ভগবন্! দেব-রায়কে আশীর্ব্বাদ করুন।" ব্রাহ্মণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন; বলিলেন, "না মধুরাও! দেবরায় দীর্ঘজীবী হউক্। সে শির দেবরায়ের নহে। সে সম্রাট্ও বীর বটে, তবে অতিবৃদ্ধ; শুক্লকেশ রক্তরঞ্জিত, নয়ন বিস্ফারিত,—শীর্ণ অধরোষ্ঠ অদম্য স্পর্দ্ধাভরে কুঞ্চিত। এখনো সে মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে জাগিতেছে; সে মূর্ত্তি দেব-রায়ের নহে।"

মধুরাওয়ের মনে হইতেছিল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।— এই যুদ্ধক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য, বিজয়নগরের নিহত সম্রাট্, আহতের আর্ত্তনাদ, কপিশ চন্দ্রের মলিন প্রভা —এ সমস্তই যেন স্বপ্নের মত অবাস্তব। তিনি বিমূঢ়ের ন্যায় বলিলেন, "ভগবন্! এ কি স্বপ্ন! বিজয়নগর-সাম্রাজ্য ধ্বংস। ভগবন্, এ স্বপ্ন

হইতে আমায় জাগরিত করুন্।” লোকাচার্য্য কহিলেন, “স্বপ্ন তুমি দেখিতেছ না, মধুরাও! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছিলাম। ভগবান্ বিরূপাক্ষদেব দেবরের বিঠলস্বামী করুন্ যেন ইহা স্বপ্নই হয়।

লোকাচার্য্য মুখে এই প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু মানস-চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, রাজধানীর বিরাট অভ্রভেদী মন্দিরগুলি অগ্নি-স্পর্শে জ্বলিয়া উঠিল; নগরীর পর্ব্বতাকার প্রস্তর-প্রাচীর শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না; রাজপথে শোণিতের ধারা বহিল। বিশাল সৌধশ্রেণী আঘাতে আঘাতে কম্পিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ব্রাহ্মণের কর্ণে সেই প্রকাণ্ড নগরের ধ্বংস-যাতনা ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে মৃত্যুরাগিণী গৈরসাপ্পা-জলপ্রপাতের কল্লোলের ন্যায় গম্ভীর।

মধুরাওয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্রাহ্মণ যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলেন। মধুরাও বলিলেন, “ভগবন্! দূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানি না। কেহ ভবিতব্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। এখানে আপনার আগমন ব্যর্থ হইয়াছে। সুলতানের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। ভগবন্! মার্জ্জনা করিবেন, সে বালিকার হস্তরেখা পরীক্ষা কি ঠিক হইয়াছিল?”

লোকাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহার সেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে ক্রোধ জন্মাইতে পারে না। তিনি ক্ষুব্ধভাবে কহিলেন, “মধুরাও! মারাপ্পা আমাকে কখনো অবিশ্বাস করেন নাই। তিনিই এই মুদ্‌কল হইতে আমাকে সিকগুপে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। নগরীর কোলাহল ভাল লাগিত না বলিয়া এখানে থাকিতাম, কিন্তু মারাপ্পার আন্তরিক অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া বিজয়নগরে গেলাম। তুমি মারাপ্পার বন্ধু হইয়া আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছ?”

মধুরাও কথা কহিলেন না। সহসা দূর হইতে আলোকের আভা মধুরাওয়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ শিবিকার হেম-মণ্ডিত কাষ্ঠদণ্ড হইতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। শিবিকার লোহিত বস্ত্রাবরণ যেন আরও লোহিত দেখাইতে লাগিল। সৈনিকগণ কতকগুলি মশাল সংগ্রহ করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে এবং তৎসাহায্যে আপনাদের হতাহত সঙ্গিগণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে-আলোকে লোকাচার্য্য দেখিলেন, প্রধান নায়কের বদন হইতে সন্দেহরেখা দূরীভূত হয় নাই। কহিলেন, “মধুরাও! আমি কিয়ৎক্ষণ-পূর্ব্বে সে বালিকার কর পুনরায় পরীক্ষা করিয়াছি;—বুঝিলাম, পূর্ব্বের গণনা অভ্রান্ত। কিন্তু সে বালিকা কখন রাজরাণী হইবে না, চিরকাল রাজপুত্রবধূই থাকিবে। দেবরায় তাহার অনুসন্ধানে গিয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধান নিষ্ফল। আমি চলিলাম। মারাপ্পা আসিলে বলিও লোকাচার্য্য বিন্ধ্য-পর্ব্বতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে থাকিবে। শেষ অনুরোধ, আমার বাহকের দল গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের কোন অপরাধ নাই; ফিরিবার সময় তাহাদের লইয়া যাইও। বিরূপাক্ষদেব তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন।”

ব্রাহ্মণ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আকাশে চন্দ্ররশ্মি লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। দূরে

কঠিন ভূমির উপর অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি উত্থিত হইল। মশাল-আলোকে মধুরাও দেখিলেন, দেবরায়ের অঙ্গের স্থানে স্থানে শোণিতরেখা, মস্তক উষ্ণীষ-শূন্য, নিবিড় কেশ বায়ুভরে ইতস্ততঃ উড়িতেছে, মুখে নৈরাশ্যের ভাব। মধুরাও আঘাত-বেদনা তুচ্ছ করিয়া ত্বরিতপদে অগ্রসর হইলেন এবং ধীরে ধীরে সম্রাটের ক্লান্ত দেহ আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন।

গ্রামের অপর অংশে বন-পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি অশ্ব কুলবর্গ অভিমুখে ছুটিয়াছে। অশ্ব-পৃষ্ঠে সেই তরুণ-তপনকান্তি মুসলমান যুবক। এক হস্তে অশ্ববল্গা ধৃত, অন্য হস্ত প্রীতার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যুবক ভাবিতেছিলেন, যুদ্ধে জয় তাঁহার, কারণ রত্ন তাঁহার হস্ত-বেষ্টনীর মধ্যে। সে বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া প্রীতার দেহলতা বারংবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল।

(ক্রমশঃ)

আমাদের খাদ্য।

আমিষ আহার।

মৎস্য।—আমিষ আহারের মধ্যে মৎস্যই আমাদের দেশে প্রধান। মৎস্যে প্রোটিনের (Protein) এর ভাগ মাংসের সমান, যদিও বিভিন্ন-জাতীয় মৎস্যে ইহার পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অল্প পরিমাণ তৈলীয়-ভাগ-বিশিষ্ট মৎস্য সহজে পরিপাক হয়, কিন্তু ইহার পুষ্টিকর গুণ অল্প। তৈলযুক্ত মৎস্য গুরুপাক কিন্তু অধিক পুষ্টিকর, যদিও সময় সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।—খুব শক্ত-মাংসযুক্ত মৎস্যের শীঘ্র পরিপাক হয় না।

লবণে রক্ষিত কিংবা শুষ্ক (শুঁট্‌কী) মৎস্যে জলের পরিমাণ অল্প; সেজন্য ইহাতে টাট্‌কা মৎস্যের উপাদান অপেক্ষা সকল উপাদানের পরিমাণ অধিক। কিন্তু উপকারিতায় টাট্‌কা মৎস্য অপেক্ষা অধিক কি-না তাহা সন্দেহ।

মাছের মুড়াতে মস্তিষ্কের উপকারী পদার্থ আছে কি-না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূল্য-হিসাবে সস্তার তৈলযুক্ত মৎস্যই আয়প্রদ, কিন্তু বাজারের দাম-হিসাবে খাদ্য দ্রব্যের উপকারিতা নির্ণয় করা সকল সময় সম্ভবপর নয়।

কাঁকড়া, চিংড়ি, সামুক, ঝিনুক প্রভৃতিকে মৎস্যের মধ্যেই গণ্য করা হয়। ইহাদের মাংস অপেক্ষা পেশীই প্রধান। কিন্তু মৎস্য অপেক্ষা ইহারা গুরুপাক-খাদ্য। সামুকও গুগ্‌লী-জাতীয় খাদ্য কাঁচা খাইলে সহজে পরিপাক হয়। মাংস অপেক্ষা ইহাদের পুষ্টিকর গুণ কম, এবং কোন কোনটীর পুষ্টিকর গুণ দুগ্ধের সমান।

মাংস।—গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, খরগোস ও পক্ষীর মাংসই সাধারণতঃ মানবের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। গোমাংশ আমাদের দেশীয় আহার নহে। ইহা অন্যান্য মাংস অপেক্ষা গুরুপাক এবং সকল মাংস অপেক্ষা ইহাতে প্রোটিনের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভেড়ার মাংসও যদিও আমাদের দেশে অধিক ব্যবহৃত হয় না, তথাপি ইহা স্বাদু ও সহজে পরিপাক হয়। ভেড়ার মাংসে চর্ব্বির ভাগ অন্যান্য মাংস অপেক্ষা অধিক। যদিও ভেড়ার মাংসে প্রোটীনের ভাগ বেশী, কিন্তু চর্ব্বি কম ও জলীয় ভাগ অধিক।

ছাগ-মাংসই আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত এবং ইহাতে চর্ব্বির পরিমাণ অধিক নহে।

মাংসের চারিভাগের তিন ভাগ জলীয় পদার্থ এবং ইহার কমবেশী চর্ব্বির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ছোট জানোয়ারের মাংসে জলের পরিমাণ অধিক এবং ইহার পুষ্টিকর গুণ অল্প। প্রোটীনও সেই হিসাবে বিভিন্ন। যদিও মাংসে খনিজ পদার্থ (mineral substance) খুবই কম, কিন্তু ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। মাংসের রসের লালবর্ণের মধ্যে লৌহ বর্ত্তমান, এবং মাংসের রসে(meat juice) ফস্ফরিক এসিড ও পটাস থাকে। মাংসের নির্য্যাস জলে সিদ্ধ করিয়া বাহির করা যায়। পূর্ণবয়স্ক জন্তুর মাংস হইতেই পুষ্টিকর নির্য্যাস পাওয়া যায়। নির্য্যাসের গুণাগুণ জন্তুর আহারের উপর নির্ভর করে। বন্যপক্ষী কিংবা খরগোসের মাংসের স্বাদেও গৃহপালিত পক্ষী কিংবা খরগোসের মাংসের স্বাদে অনেক প্রভেদ।

মাংস কাটিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে অনেক সময় স্বাদের উন্নতি হয়। ইহার কারণ, ঐরূপ ঝুলাইয়া রাখার সময় এসিডের কার্য্য দ্বারা ইহার স্বাদ পরিবর্ত্তিত হয়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে, পচনক্রিয়ার দ্বারা মাংসের স্বাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে।

রন্ধনকালে সিদ্ধ করিবার গুণে মাংসের পেশীস্থ সূত্রগুলি শিথিল হয় ও চর্ব্বি ও জলীয় ভাগ অনেক কমিয়া যায়।

মাংসের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান প্রোটীন, কিন্তু বিভিন্নপ্রকার মাংসের পুষ্টিকর গুণ সচরাচর চর্ব্বির কম-বেশী অনুসারেই নির্দ্ধারিত হয়। যদিও মাংস একটী সম্পূর্ণ আহার নহে, কিন্তু ইহা সহজেই পরিপাক হয় এবং ইহাতে শক্তি-বৃদ্ধিকারী ও পেশী-গঠনকারী মূল্যবান্ উপাদানসমূহ বর্ত্তমান। মাংস অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য আহার, বিশেষতঃ, যখন ছোট ছোট জন্তুর মাংস ব্যবহার করা হয়।

ডিম্ব।—ডিম্বের পুষ্টিকর উপাদান মাংসেরই সমান, কিন্তু ইহাতে তৈলীয় পদার্থ (fat) অধিক এবং প্রোটীন কম। ডিম্বে শর্করা-জাতীয় উপাদান একেবারে না থাকায় ইহা রুটী, ময়দা, পায়স প্রভৃতি সকলপ্রকার খাদ্যের সহিতই মিশ্রিত করা যাইতে পারে। একটী ডিম্বের শক্তিসঞ্চারক ক্ষমতা তিন পোয়া মাংস কিংবা আধ সের খাঁটী দুগ্ধের সমান।

সকল-জাতীয় ডিম্বের রাসায়নিক উপাদান একই, কেবল ভিন্ন-জাতীয় পক্ষীর ভিন্ন প্রকার আহারের জন্য ডিম্বের গন্ধ বিভিন্ন। ডিম্বের খোঁসা কেবলমাত্র (carbonate of lime) কার্বনেট অব লাইম-নির্ম্মিত। ডিম্বের খোঁসার বর্ণের সহিত ডিম্বের পুষ্টি-কারিতার কোন সম্বন্ধ নাই। ডিম্বের শ্বেত পদার্থ প্রধানতঃ প্রোটীন। ডিম্বের হরিদ্রা ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর; কিন্তু ইহা কি উপাদানে গঠিত, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। ইহাতে কিছু ফসফরসযুক্ত প্রোটীন ও ইহা ব্যতীত লৌহ উপাদান বর্ত্তমান

থাকে। ডিম্ব-হরিদ্রার শতকরা ৩০ ভাগ তৈলীয় পদার্থ। মাংসের তৈলীয় পদার্থের ন্যায় ইহা অত্যন্ত বিশিষ্টভাবে হরিদ্রাংশে মিশ্রিত থাকে। হরিদ্রাংশের উপকারিতার ইহাই প্রধান কারণ। উপরি উক্ত প্রোটীন লৌহ ও চূণ মিশ্রিত হইয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। খুব সম্ভব চূণও অন্য দুই উপাদানের ন্যায় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত থাকে। দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে এ পরিমাণ চূণ নাই। ডিম্বের হরিদ্রাবর্ণ যত গাঢ় হইবে, ইহাতে লৌহের পরিমাণ ততই অধিক বুঝিতে হইবে। একটী ডিম্বের লৌহ-ভাগের পরিমাণ ১৮ আউন্স (আধসের) দুগ্ধের সমতুল।

চূণের জলে ডুবাইয়া রাখিলে ডিম্ব অনেক দিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

(ক্রমশঃ)

ডিম।

মানব-শরীরের পুষ্টি-সাধনের জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সকল দ্রব্য ডিমের ভিতর আছে বলিয়া ডিম মানবের একটি খাদ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে হাঁস ও মুর্গী এই দুইটী পাখীর ডিমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সম্বন্ধেই এইস্থলে কিছু বলিতেছি।

ডিমের উপরকার খোলাটি সমস্ত ডিমটির প্রায় দশমাংশ। ইহার মধ্যে পুষ্টিকর কিছু নাই বলিয়া, ইহাকে ত্যাগ করা হয়। খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সেই দ্রব্যের নাইট্রোজিনাস্ বা যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে।

খোলাটির নিম্নে শ্বেতবর্ণ পদার্থ। ইহার শতকরা ৮৫ ভাগ জল। অবশিষ্ট ১৫ ভাগ কঠিন পদার্থ; তন্মধ্যে ১২ভাগ প্রোটিন * (egg albumin), অর্দ্ধভাগ চিনি, সামান্য Fat (স্নেহজাতীয় দ্রব্য) এবং অন্যান্য দ্রব্যও সামান্য সামান্য আছে। উত্তাপের সহিত এই অংশ কঠিন হইতে থাকে।

শ্বেতাংশের ভিতরের পদার্থকে Yolk (বা কুসুম) কহে। ইহার দুইটী অংশ—একটা হরিদ্রা-বর্ণের, অপরটি বর্ণহীন, অর্থাৎ জলের ন্যায়। ইহা খাদ্য-ভাণ্ডার। ইহাতে অল্প-পরিমাণে, fat (স্নেহজাতীয় পদার্থ), লৌহ এবং ফস্‌ফরাসের যৌগিক পদার্থ আছে। এতদ্ব্যতীত ভাইটেলিন্ নামে ফস্‌ফোপ্রেটিন্-পদার্থও আছে। ইহাই ডিম্বমধ্যস্থ প্রাণীটির পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার ভিতরে অল্প-পরিমাণে এলবুমেন এবং তৈলময় পদার্থ আছে। উত্তাপ পাইলেই আলবুমিন কঠিন হইয়া যায়; সেইজন্য ভিতরকার পীতাংশ শীঘ্র কঠিন হয় না।

মুর্গীর ডিমের ভিতরের দ্রব্যগুলি ও হাঁসের ডিমের ভিতরের দ্রব্যগুলি সমস্তই ঠিক এক নহে। আর যে সমস্ত জিনিষ আছে, তাহাদের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খাদ্যের পুষ্টিকারিতা নাইট্রোজেন বা যবক্ষারযুক্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে। সেই-হিসাবে মুর্গীর ডিম বেশী পুষ্টিকর। কারণ, মুর্গীর ডিমে পীতাংশ শ্বেত-পদার্থের অর্দ্ধেক

---

* প্রোটিনের উপাদান—কার্ব্বন, উদজান, যবক্ষারজান, গন্ধক ও অম্লজান।

এবং হাসের ডিমে ইহা অনেক কম। সেই পীতাংশে প্রোটিন বেশী এবং অন্যান্য যবক্ষারজানযুক্ত বা ছানা-জাতীয় পদার্থও আছে; কিন্তু শ্বেত অংশের মধ্যে সেরূপ নাই।

ডিমের পুষ্টিকারি-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। একটা মুর্গীর ডিম প্রায় অর্দ্ধসের দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টি-সাধন করে। একটি ডিমের শতকরা ৫ ভাগ নষ্ট হয়, বাঁকি সমস্তই দেহের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার ভিতর লৌহ থাকায়, যখন আমাদের শরীরে ইহা গৃহীত হয়, তখন লৌহ রক্তে মিশিয়া রক্ত-কণিকার সংখ্যা বর্দ্ধিত করে এবং রক্তের পরিমাণেরও বৃদ্ধি করে। ইহার মধ্যে ক্যালসিয়াম-ধাতু যে অবস্থায় আছে, তাহার সমস্তই দৈহিক উপাদানে মিশ্রিত হয়। দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে এরূপ পদার্থ নাই। সেইজন্য অস্থি ভগ্ন হইলে চিকিৎসকগণ প্রায়ই ডিম খাইতে বলেন। কারণ, হাড়ের পরিপুষ্টি ক্যাল্‌সিয়ম্‌-দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

ডিম্বের পরিপাক রন্ধনের উপর নির্ভর করে। অসিদ্ধ ডিম্ব অপেক্ষা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব অল্প সময়ে পরিপাক হয়। ডিম অসিদ্ধ অবস্থায় খাইলে উহাকে চিবাইতে পারা যায় না এবং লালাও ভালরূপ নিঃসৃত হইতে পারে না। এজন্য উহার পরিপাক শীঘ্র হয় না। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব পূর্ণসিদ্ধ ডিম্ব অপেক্ষা অল্প সময়ে পরিপাক হয়; কারণ, পূর্ণ সিদ্ধ ডিম্বে প্রোটিন পদার্থ অত্যন্ত কঠিন হয় এবং উত্তমরূপে না চিবাইলে উহার সহজে পরিপাক হয় না।

আমাদের দেশে যাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদের পক্ষে শীতকালে ডিম খাওয়াই প্রশস্ত। কারণ, এই সময়ে শরীর অত্যন্ত কার্য্যক্ষম হয়। ডিম খুব বেশী খাওয়া উচিত নহে এবং খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়াও উচিত নহে। কারণ, ডিমের শ্বেতাংশ সমস্তটা পরিপাক হইয়া নির্গত হইতে না পারিলে, মূত্রে (Albumin) হয়। জলবায়ু এবং শরীরের ধাত বুঝিয়া ডিম খাওয়া উচিত।

ডিম অনেক দিন গৃহে রাখিতে হইলে চূণের জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। ১ পাইণ্ট জলে ১ ছটাক লবণমিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে ডিম ডুবাইয়া রাখিলে খারাপ ডিমগুলি ভাসিয়া উঠিবে। নষ্ট ডিম অত্যন্ত অপকারী, ইহা বিষাক্ত।

একটী ডিম না খাইয়া অনেক দিন ঘরে তুলিয়া রাখিলে, উহা ভিতরে ভিতরে খারাপ হইতে থাকে এবং পরে অত্যন্ত জোরে শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। তখন অত্যন্ত বিষাক্ত দুর্গন্ধও বাহির হইতে থাকে।

ডিম সিদ্ধ করিতে হইলে জল খুব ফুটাইয়া তাহাতে ডিম দিয়া নামাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে ডিম অর্দ্ধসিদ্ধ হয়। যদি ডিমের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া ফুটান হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহার জলমগ্ন অংশ উত্তাপ পাইয়াছে এবং কঠিন হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বের মতই আছে।

আমাদের একটী সংস্কার যে হাঁসের ডিম খাইলে বাত হয়, কিন্তু ইহাতে বাতের পক্ষে অনিষ্টকারী কিছু নাই। সুতরাং ইহা খাইলে কোন অনিষ্ট না হইতে পারে। তবে জলবায়ু ও শরীর দেখা উচিত। সমস্ত ডিমটার পরিপাক হওয়ার দরকার, নতুবা অনিষ্ট হইতে পারে। অল্প-পরিমাণে ডিম-ভক্ষণ আমাদের উপকারী, অপকারী নহে।

শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য।

প্রেমের শক্তি।

(পারস্য ইতিহাসের গল্পাবলম্বনে রচিত)

রাজার গুণের তুলনা ছিল না; দেশের লোকেরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু রাজা বড় অসুখী; কারণ, তাঁহার পুত্র একটি জড়-পিণ্ড। রাজপুত্রকে দেখিয়া কাহারও মনে হইত না যে তাঁহার কোন বোধশক্তি আছে। রাজ্যের যত বীর তাঁহাকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে আসিতেন; রাজপুত্র বিহ্বলনেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতেন। দেশের যত পণ্ডিত রাজপুত্রকে লেখা-পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মূর্খত্ব ঘুচিল না। এই জড়ভরতের মত পুত্র লইয়া রাজা কি করিবেন? কতজন কত দেশের গল্প করিত, কিন্তু রাজপুত্র প্রাসাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া একদিনও বাহিরে আসিলেন না। প্রাসাদের বাহিরের শ্যামলা উজ্জ্বলা ধরণীর সহিত রাজপুত্রের একদিনও পরিচয় ঘটিল না। নদীর নৃত্য, গিরির মহিমা, কাননের গাম্ভীর্য্য সবই অনাঘ্রাত পুষ্পের মত দূরে পড়িয়া থাকিত।

বিজয়-মাল্য লইয়া যখন রাজার বাহিনী ফিরিয়া আসিত, রাজপুত্র সে বাহিনীর নেতা বা দর্শক কিছুই থাকিতেন না। রাজা শিকার করিয়া আসিতেন, রাজপুত্র স্তব্ধ হইয়া পিতার কীর্ত্তি দেখিতেন। রাজপ্রাসাদের উচ্চকক্ষের এক কোণে বসিয়া তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, যেন তিনি সেই পাষাণ-গৃহের একখণ্ড মর্ম্মর-প্রস্তর। তাহার পর গভীর রজনীতে সারা জগৎ নিঝুম হইয়া আসিলে যেমন দীর্ঘ তরু তাহার নিশ্চল পত্র-শাখা সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তিনি সেইরূপ অবশ আলস্যে মর্ম্মর-হর্ম্ম্যের সুখ-শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া দিতেন।

এমন নিশ্চিন্ত অসাড় প্রাণে সহসা ভাবের লীলা দেখা দিল। আঁধার গগনে একটি ক্ষীণ রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। রাজবাড়ীর নিকটে এক দরিদ্র বাস করিত। তাহার কুটির-আলো-করা এক মেয়ে ছিল। রাজপুত্র জানালা হইতে সেই মেয়েটিকে দেখিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন। সব দেশেই গরীব লোক আছে; গরীবের মেয়ের রূপ, দেশের রাজপুত্র ও রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারও বিরল নহে। কিন্তু এ-রকম রাজপুত্র, যাঁহার মত মূর্খ রাজ্যে ছিল না, যিনি আহার-নিদ্রা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে বলিয়া জানিতেন না, তিনিও শেষে রূপের উপাসক হইলেন!

বসন্ত আসিলে পৃথিবীর সমস্ত অঙ্গ জুড়িয়া একটি সাড়া পড়িয়া যায়। শীতের সময় যে বাতাস স্তব্ধ হইয়া থাকে সেও তখন চঞ্চল হইয়া উঠে। আজ রাজপুত্রের জীবনে বসন্ত আসিয়াছে। তাঁহার জীবনের আজ সুপ্রভাত। প্রেমের আলোকে তাঁহার তরুণ হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র কুটিরের দুয়ারে উষার মত নিরাভরণা বালিকাটি দাঁড়াইয়া। তিনি রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন আসিলেন, তখন সে কুটীরের ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। কতবার তিনি কুটীরের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, যাহার জন্য এ ব্যাকুলতা তাহার দেখা তখন আর মিলিল না।

শিক্ষক প্রতিদিন সকালে যেমন প্রাসাদে

পড়াইতে আসেন আজও তেমনি আসিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্র ঘরে নাই। জানালার ধারে গিয়া দেখিলেন, দূরে সবুজ গাছের তলায় নদীর ধারে রাজপুত্র একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তাহারা উভয়ে কুটিরের নিকটে আসিলে তিনি মেয়েটীকে চিনিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্রের মুখে একটি নূতন ভাব আসন পাতিয়াছে আর তাঁহার চোখে একটি নূতন আলোক খেলা করিতেছে।

ঘুমন্ত শিশুর অধরে যেমন একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা লাগিয়া থাকে, রাজপুত্র সেইরূপ একটী সুখের ভগ্নস্মৃতি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পড়া সে-দিনও হইল না। শিক্ষক দেখিয়া গেলেন, আজ সে জড়পিণ্ড নিশ্চল নহে বটে, কিন্তু বড় অন্যমনস্ক।

পরদিন সূর্য্যের আলোকে চারি দিক্ ঝল্‌মল্ করিতেছিল। শিক্ষক প্রাসাদে আসিবার সময় দেখিলেন, বাহিরে বাগানের পাশে রাজপুত্র মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিতে-ছেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্রের কথায় মেয়েটির মুখে এক রাশ রক্তের উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়িল। সে রঞ্জিত মুখমণ্ডলের কারণ রাজপুত্রের ভাষা, প্রভাত-সূর্য্যের রক্ত আভা নহে।

তিনি রাজপুত্রের কক্ষের অভিমুখে না যাইয়া রাজার নিকটে গেলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিতের শীর্ণমুখে বেদনা ও ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠি-য়াছে। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আজ বড় ক্ষোভে আপনার নিকটে একটি কথা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এত দিন রাজপুত্রকে শুধু মূর্খ বলিয়াই জানিতাম, আজ জানিলাম, তিনি দুশ্চরিত্র। প্রাসাদের নিকট যে দরিদ্র ব্যক্তি বাস করে, তাহার ফুলের মত সুন্দর একটি কন্যা আছে। রাজপুত্র সেই বালিকাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

এতদিন রাজার প্রশস্তললাটে সকল সময়েই চিন্তার কালিমা মাখান থাকিত। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সে আঁধার দূর হইল। তিনি উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর এতদিনে প্রসন্ন হইয়া-ছেন! আজ মাটির পিণ্ডে স্পন্দন আসিয়াছে।"

শিক্ষক প্রতিকারের আশায় আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এমন সময় সেই জীর্ণ কুটিরের দীন অধিবাসী অভিবাদন করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে বলিল, "মহারাজ! বিচার চাহি।" রাজা বলিলেন, "তোমার অভিযোগের কথা বল।" রাজার ন্যায়-বিচারের কথা সকল প্রজাই জানিত। সে সঙ্কোচ না করিয়া বলিল, "যুবরাজ আমার কন্যার প্রণয়-প্রার্থী! ফল কি হইবে জানি না। ইহাতে আমাদের সম্মান চির-কালের জন্য নষ্ট হইতে পারে।" রাজা বলিলেন, "সে কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। প্রজার সম্মান রাজার বিলাসের সামগ্রী নহে। তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার আমার। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। তোমরা কি আমার পুত্রকে চেন? সে ত' কখন প্রাসাদের বাহিরে পূর্ব্বে যায় নাই, আর তাহার বেশভূষাও যুবরাজের মত নহে।" কুটিরবাসী বলিল, "আমি কয়েকবার প্রাসাদে পুষ্পমালা দিতে আসিয়াছিলাম। মহারাজের শিকার বহিয়াও অনেকবার আসিয়াছি। আমি যুবরাজকে প্রাসাদে দুইবার দেখিয়াছি। আমার কন্যা কখনও দেখে নাই, সে এখনও

জানে না যে তিনি যুবরাজ।" রাজা বলিলেন, "এখন আমার কথা শোন। তোমার কন্যার দ্বারা দেশের মহা উপকার সাধিত হইতে পারে। আমার পুত্র তাহাকে ভালবাসে; সুতরাং সে যাহাই বলিবে, আমার পুত্র তাহাই করিবে। তোমার কন্যাকে বলিও সে যেন যুবরাজের মনে সকল বিষয়ে দক্ষতা-লাভ করিবার বাসনা জাগাইয়া তোলে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার পুত্র সব করিবে। সে মূর্খ, বিদ্বান্ হইবে; সে অলস বীর হইবে, তাহার সেই রক্ত-মাংসের পাষাণ দেহে প্রাণ-সঞ্চার হইবে। বড় গুরুভার তোমার মেয়ের উপর রহিয়াছে। যদি এ-কাজ সিদ্ধ হয়, দেশের অশেষ মঙ্গল। নচেৎ আমার মৃত্যুর পর রাজ্যে অত্যাচার ও রক্তপাতের স্রোত বহিবে। বল, তোমার কন্যা কি এ ভার বহিতে পারিবে?"

কৃষক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। রাজা ভাবিতেছিলেন নিজ-পুত্রের ভবিষ্যৎ; শিক্ষক ভাবিতেছিলেন রাজার সহৃদয়তা ও মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতার কথা। কন্যার পিতা বলিল, "বুঝিয়াছি, মহারাজ! আমার মেয়ের যাহা সাধ্য করিবে।" রাজা বলিলেন, "তোমার কন্যা যেন তাহাকে শুদ্ধ আশা দেয় যে যুবরাজ তাহার প্রেমের উপযুক্ত হইলেই তাহাকে লাভ করিতে পারিবে। সে যদি কেবল এইটুকু করিতে পারে, প্রেম অবশিষ্ট সমস্তই করিবে। এ কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিবার যদি ক্ষমতা থাকে, সে আপনার সম্মান আপনিই রাখিতে পারিবে।"

পিতার নিকট হইতে কন্যা সব শুনিল। সেও যুবরাজকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু তখন জানিত না যে তিনি যুবরাজ। যুবরাজের কথা সকলেই জানিত, সেও জানিত। কিন্তু আজ যুবরাজ তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী জানিয়াও তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল না! সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার উপর কি গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত হইতেছে। সে দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিল। দেশের সুখ-দুঃখ, শান্তি-রক্তপাত, বিচার-অত্যাচারের জন্য সেই এখন দায়ী। সে মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন সে রাজপুত্রের জীবনে পূর্ণতা—সফলতা আনিয়া দিতে পারে।

রাজপুত্র তন্ময় হইয়া বালিকাকে দেখিতে-ছিলেন। কুটিরের মাটির দেওয়ালে কুটির-স্বামীর অস্ত্র ঝুলিতেছিল! বালিকা কহিল, "কুমার! তুমি কি এ অস্ত্রের ব্যবহার জান?" রাজপুত্র বলিলেন, "না, আমি কোন অস্ত্রেরই ব্যবহার জানি না।" পর দিন প্রভাতে যখন রাজপুত্র বলিলেন, "এস, বনের ধারে পাহাড়ের তলায় বেড়াইয়া আসি।" তখন বালিকা বলিল, "না, বাবা বলিয়াছেন, 'ওখানে যত হিংস্র পশুর বাস।' গেলে তোমার বিপদ্ ঘটিতে পারে।" রাজপুত্র বলিলেন, "ঠিক্ কথা। তারা তোমার অনিষ্ট করিতে পারে।" তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া সেনাপতিকে বলিলেন, "আমাকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিন্।"

রাজা যে-দিন সেনাপতির নিকটে শুনিলেন, তাঁহার পুত্র ধনুর্বিদ্যায় তাঁহারই সমান হইয়াছে সে-দিন, বুঝিলেন রাজপুত্রের শিক্ষার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

রাজপুত্র এইবার একদিন বালিকাকে বলিতেছিলেন, "চল, আজ যাই, আজ কোন ভয় নাই।' তখন রাজপুত্রের কটিতে হীরক-

খচিত তরবারীর প্রান্ত ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল, এবং হস্তে ধনুর্ব্বাণ বীরত্বের পরিচয় দিতেছিল। সে-দিন কাননের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া রাজপুত্রের মুখ হইতে যে ভাষার স্রোত বহিল, তাহা আপন বীরত্বে আপন ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেই বাহির হইতে পারে।

একদিন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য যখন পৃথিবীর সর্ব্ব অঙ্গে তাঁহার দীপ্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন বালিকা বলিল, "কুমার! আমাকে লেখা-পড়া শিখাইতে পার? আমার বড় ইচ্ছা আমি লিখিতে পড়িতে শিখি।" রাজপুত্র বলিলেন, "আমি ত' ও সব জানি না।" বালিকা বলিল, "তবে আর আমার শেখা হইল না।" বালিকার নৈরাশ্যে রাজপুত্র মনে ব্যথা পাইলেন; বলিলেন, "আচ্ছা! কিছুদিন পরে আমিই তোমাকে শিখাইব।"

সে-দিন পণ্ডিত-মহাশয় আপনার গৃহে আহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় রাজপুত্র আসিয়া বলিলেন, "আমাকে পড়ান্। আমি পড়িতে চাহি।" শিক্ষার জন্য তখন তাঁহার কি উৎসাহ, কি অধ্যবসায়! প্রেমের দ্বারা এইরূপে রাজপুত্রের জীবনকুসুমের আর একটি দল খুলিয়া গেল। রাজা, শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কুটির-বাসিনী কন্যা কি যাদু জানে?

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। কুটিরের ছিদ্র দিয়া তপনের শেষ কিরণ দীর্ঘ অঙ্গুলীর আকারে আসিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় বালিকার মস্তকে পড়িয়াছে। তাহার পার্শ্বে বসিয়া রাজপুত্র পাঠ বলিয়া দিতেছেন। পুস্তকের দিকে তাহার আজ দৃষ্টি ছিল না। সে কেবল কুমারের উৎসাহ-ভরা মুখের পানে চাহিয়া ছিল। যুবরাজের কথা সে শুনিতেছিল না;—সে শুনিতেছিল শুধু তাহার ঝঙ্কার, আর ভাবিতেছিল কতদিন আর পরীক্ষা চলিবে। রাজপুত্র বলিলেন, "আজ তোমার পড়ায় মন নাই, চল, বেড়াইতে যাই।" পাঠ সাঙ্গ না করিয়া দুইজনে নদীর ধারে আসিলেন।

তখন দিগন্তের কোলে ঘনকৃষ্ণ-বন-রেখার অন্তরালে অস্তগামী তপন ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল। সেই তরল-কনক-কিরণজালের যবনিকার পরপ্রান্তে কত অজানা দেশ লুকাইয়া আছে! সঙ্গিনী বলিল, "কুমার! ওখানে কি দেশ আছে তুমি ত কত বই পড়িয়াছ, ঐ দেশের গল্প বল।" রাজপুত্র বলিলেন, "ও-সব দেশের কথা পড়ি নি। তবে তুমি যদি বল, আমি ও-গুলি দেখিয়া আসিতে পারি।" তাঁহার কণ্ঠে ও চোখের ভাষায় একটি অস্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। বালিকা বলিল, "তাই যেও। ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকট গল্প করিও!" যুবরাজ বলিলেন, "তোমার পড়া ত' তাহা হইলে হ'বে না।" বালিকা বলিল, "তুমি এলে হ'বে।" রাজকুমার ক্ষণকাল নীরব থাকিলেন। বালিকা ভয় করিতেছিল, বাঁধন শক্ত হইলে পাছে ছিঁড়িয়া যায়! কিন্তু ফুলের মালার বাঁধন যতই শক্ত হয়, স্পর্শ ততই কোমল হয়। যুবরাজ এইবার প্রাণের কথা বলিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "কত দিন তোমাকে দেখিতে পাইব না!" বালিকা বুঝিল এবারও প্রেমের জয় হইয়াছে। সে হর্ষ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "আমি প্রতিদিন ঠিক্ এমনই সময় এখানে দাঁড়াইয়া তোমারই কথা ভাবিব। ভাবিব,

আমার সম্মুখ হইতে যে সূর্য্য বিদায় লইতেছে, সে তোমারই নিকট যাইবে।" রাজপুত্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "যখন এই বাতাসের ঢেউ গিয়া আমার দেহে লাগিবে, আমি ভাবিব, তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান লুপ্ত হইয়াছে।"

তিনটি বৎসর পরে নূতন জীবনের তিনটি অধ্যায় শেষ করিয়া রাজকুমার প্রাসাদে ফিরিলেন। তিনি কুটিরে আসিয়া দেখিলেন যে, বালিকার রূপ যেন আরও বাড়িয়াছে। কেবল শ্যামল তট-ঘেরা সরোবরের কালো জলের মত কালিমাভরা চক্ষু-দু'টি ছল ছল করিতেছে। রাজপুত্রের আনীত উপহারের রাশি পড়িয়া রহিল। সে কেবল গল্প শুনিয়া দীর্ঘ দিন গুলি কাটাইতে লাগিল।

তারপর একটি শান্ত জ্যোৎস্না-রাতে প্রলয়-রোলের ন্যায় রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেশের বাহিরে শত্রু আসিয়াছে। রাজার সৈন্য যুদ্ধে যাইবে। তরুণীর মুখ তখন চন্দ্রমার রশ্মির ন্যায় কপিশ। সে ভয়-কণ্ঠে কহিল, "কুমার! এ যুদ্ধে সেনাপতি কে?" তাহার ওষ্ঠ বলিতে চাহে, 'এ যুদ্ধে কি অন্যের সেনাপতি হওয়া সাজে? তোমার দেশ, তোমার রাজ্য, তোমার সৈন্য প্রাণ দিতে যাইতেছে, তুমি পথ দেখাইয়া না দিলে আজ বড় অপমান, বড় লজ্জা! তুমি যাও।" কিন্তু নয়ন তখন বলিতেছিল, 'কোথায় যাইবে? যাইও না, আমি একেলা থাকিব কেমন করিয়া?' রাজপুত্র উত্তরে বলিলেন, "এ যুদ্ধে আমিই সেনাপতি হইব, পিতার অনুমতি লইয়া আজই যাত্রা করিব। যদি না আসি—' ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া তরুণী কহিল, "তাহা হইলে ঐখানে আবার দেখা হইবে।"

জীবনের চারি অংশ পূর্ণ করিয়া চারি মাস পরে বিজয়ী কুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন। উন্মত্ত ঝঞ্ঝার মত যখন তিনি শত্রুসৈন্য মথিত করিতেছিলেন, তখন চঞ্চলা চপলার ন্যায় প্রণয়িনীর হাস্য তাঁহার মানসপটে ভাসিতেছিল; যখন অশ্বক্ষুরাহত ধরণী-বক্ষ হইতে উত্থিত ধূলি-জালে শত্রুব্যূহ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন জলপ্রপাতের শ্বেত বাষ্পরাশির উপর রচিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় তরুণীর বিশাল নয়নের জ্যোতিঃ সে ধূলির আঁধার আলোকিত করিতেছিল। অস্ত্রের ঝনঝনা ও বর্ম্মের সঙ্ঘর্ষণের মধ্যে তিনি তাহারই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলেন; আজ যুদ্ধের অবসানে তিনি তাঁহার মানস-প্রতিমাকে নয়ন-সম্মুখে বিরাজিত দেখিলেন। সে প্রতিমা দুইজনের পিতার মধ্যস্থানে স্থাপিত—আজ তাহার বধূ-বেশ!

উপদেশের ঝুড়ি।

সকালে উঠে ঘর ঝাঁট্ দেওয়া আমাদের সংসারে একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। সচরাচর আমরা প্রথমে ঝাঁট দিয়া পরে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিই। কবি রবীন্দ্রনাথের 'জুতার জন্ম' বলে কবিতায় রাজার পায়ে ধুলো যা'তে না লাগে, সেই জন্য রাজ্যের যত ঝাড়ু-দার মিলে ধুলো তাড়াতে আরম্ভ করুল! তারা এমন জোরে ঝাড়ু চালাতে লাগ্‌ল যে

দেশ ধূলোয় ভরে গেল, পায়ের ধূলো মাথায় গিয়ে উঠ্‌ল, আর দেশের লোকের দম বন্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল। আমাদের ঘরে ঝাট্‌ দেওয়াও ঠিক্‌ ঐ রকম ব্যাপার। সে সময় ঘরে যে থাকে, তা'র নাকে, মুখে, চোখে ধূলো যায়, আর ঘরের যত ধূলো উপরে উঠে আস-বাব্‌-পত্রের উপর জমে। ধূলো এত উপকারী জিনিশ নয় যে, নাকে মুখে চোখে বিছানা ও আল্‌মারীর ওপর তাকে স্থান দিতে হ'বে। যদি উপকারী হ'ত, তা হ'লে আর ঝাঁটা দিয়ে তা'কে দূর করে দেওয়ার দরকার হ'ত না। ধূলো অপরিষ্কার ত' বটেই, তা ছাড়া রোগ ছড়িয়ে দিতেও সময়ে সময়ে সাহায্য করে। ঝাঁট দেওয়ার পর যে জল ছিটান হয়, তাতে কতকটা ওড়া ধূলো জলের সঙ্গে নীচে পড়ে। ফলে ঘরের ধূলো ঘরেই থেকে যায়। ঝাঁট দেবার আগে কুচি কুচি করে কাগজ মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে তারপর ঝাঁট দিলে বেশী ধূলো উড়্‌তে পারে না সত্য, কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল উপায়, প্রথমেই মেঝেয় জল ছিটিয়ে দেওয়া। সেই জলটা অল্প শুকিয়ে গেলে ধূলো সব ভিজে থাকে, ওপরে উঠ্‌তে পারে না। তখন ঝাঁট দিলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। ঝাঁট দেবার সময় আঁচলটা সঙ্গেই থাকে; সেটা সে-সময় নাক-মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে কাপড়ের ত' কোন ক্ষতিই হয় না, অথচ শরীরের পক্ষে উপকার হয়।

বাজার থেকে তরিতরকারী এলে একবার ধুয়ে নিতে পার্‌লে ভাল হয়। কত অস্থান কুস্থান, ময়লাগাদায় কি তরকারী জন্মায় কেউ তা' দেখ্‌তে যায় না। সেই জায়গার মাটি তরকারীর গায়ে লেগে থাক্‌তে পারে। তার-পর অপরিষ্কার পাত্রে বা ছেঁড়া কাপড়ের ওপর রেখে লোক সে-সব বাজারে বিক্রী করে। তরকারী কুটে একবার ধোয়া হয়, আগুণে সিদ্ধ হ'লে পরে তার অনেক দোষ কেটে যায়। কিন্তু যে সব ফল-মূল না রেঁধে খাওয়া হয়, সে-গুলির একটা উপায় আগে হ'তে করে রাখা ভাল। তরকারী, ফল-মূল ঘরে তুল্‌বার আগে একবার ধুয়ে নিলে ছোঁয়া-ন্যাপার জন্য কোন বিপদের ভয় থাকে না। তবে মন-বোঝান ধোয়াতে কাজ হয় না। অনেক সময় মেয়েরা বাজার থেকে আনা তরকারী-গুলোর ওপর দু'এক ফোঁটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। গঙ্গাজল যে খুব শুদ্ধ, তাতে আর ভুল নেই। তবে ছিটে ফোঁটায় বিশেষ ফল হয় না। একেবারে সবগুলোর ওপর ঘটি-কতক গঙ্গাজল ঢাল্‌তে পার্‌লে আর কোন ভাবনার কারণ থাকে না। কিন্তু গঙ্গাজল এত সস্তা নয়। সুতরাং, পাতকুয়া বা ইদারার জল এক-আধ ঘড়া দিলে হানি কি? আমাদের বাংলা-দেশকে কবিরা সুজলা সুফলা বলেন। এখানে যত ফল তত জল। আরব-দেশ বা রাজপুতানার মত এখানে জলের অভাব নেই। সুতরাং, এখানে ও-বিষয়ে কৃপণ না হওয়াই উচিত।

ধোপার-বাড়ী হ'তে কাপড়-চোপড় এলেও একবার অন্ততঃ জল-কাচা করে নেওয়া উচিত। যে কাপড় কাচে, সে সকল সময় ভাল জল পায় না, আর এত লোকের কাপড় তাকে কাচ্‌তে হয় যে, সব আলাদা করে পরিষ্কার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে যদি তেলের দাগ ও ময়লা সাফ্‌ করে দিতে

পারে তা' হলেই বুঝ্‌তে হ'বে ঢের হ'ল। কাচ্‌বার সময় কত রকম লোকের, কত রোগীর কাপড়-চোপড় এক সঙ্গেই কাচ্‌তে হয়। সময় সময় ধোপাবাড়ীর টাট্‌কা-ফেরৎ কাপড় ব্যবহার করে দাদ, চুলকানি, পাঁচড়া আরও কত খারাপ রোগ হয়। সব বাড়ীতে এ রকম কাপড় গরম-জলে ফুটিয়ে নেবার উপায় থাকে না। আর থাকলেও তা'র ইচ্ছা বা সময় হয় না। কিন্তু সে সব একবার জলকাচা করে নিতে সকলেই পারেন।

পাণের গায়ে জল লেগে থাকে বলে সকলে তা' ভাল করে ধোয়া দরকার, এ-কথা ভাবেন না। পাণের দোকানে মাঙ্কাতার আমলের জলের গাম্‌লা হ'তে জল নিয়ে পাণের ওপর ছিটান হয়। যদি দোকানীর পাণের সঙ্গে তামাকের ব্যবসা থাকে, তবে এক একবার তামাক বিক্রী করে পাণ বিক্রী করার সময় সেই গামলায় সে হাত ধুয়ে লয়। পাণের ওপর সময় সময় ছোট ছোট পোকা বা পোকার ডিম থাকে। এ-রকম পাণ ভাল করে না ধুয়ে চিবানো শরীরের পক্ষে খারাপ। তারপর পাণে চূণের শক্ত কুচি থাকলে বা সুপারীর কুচি বা তা'র পাত্‌লা শক্ত খোসা থাকলে, তা' পাণের সঙ্গে পেটে যায়। ও সব জিনিশ খেলে পাথ্‌রী হ'বার সম্ভাবনা। পাণ সাজার সময় এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। পাণ খেতে গিয়ে যেন প্রাণ না দিতে হয়।

শোক সংবাদ।

ভূতপূর্ব্ব বিচারক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী গত ৮ই জানুয়ারী রবিবার চারিটি পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমা কন্যা। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা দিয়াছিল এবং তিনি এই শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি-সাধনের ও এতদ্দেশীয় নরনারীর সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য "সঙ্গীত-সঙ্ঘ" স্থাপন করিয়া তিনি বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ' বিদ্যালয়ে তিনি বহু যত্নে বিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তাদিগকে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য তিনি 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় উদ্যমেই তাঁহার পতির সহানুভূতি, উৎসাহ ও সহায়তা চিরদিনই বর্ত্তমান ছিল। পিতৃগৃহে কবিসম্রাট্‌ রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ে তিনি সরস্বতীর চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। এই বিষয় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। বেথুনবিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণের উৎসবের সময় তিনিই প্রথমে প্রকাশ্য সভায় গান করিয়া এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করেন। মৃত্যুকালে সন্তানগণের সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কেবল এক পুত্র বিদেশে ছিলেন বলিয়া আসিতে পারেন নাই।

মৃত্যুকালে-তাঁহার বয়স সাতান্ন বৎসর হইয়াছিল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার উন্নতি ও চির-শান্তি বিধান করুন্।

রিপণ কলেজের প্রবীণ অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ইংরাজী ও সংস্কৃত-সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে উচ্চ শিক্ষার যে ক্ষতি হইল, তাহার শীঘ্র পূরণ হইবে না। দেহের সমস্ত শক্তি ও প্রাণ-মন দিয়া আপন-হারা হইয়া তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এজন্য তিনি ছাত্রগণের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। পরমেশ্বর তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের শোক দূর করুন এবং তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি বিধান করুন্।

সরস্বতী-পূজা।

মাঘের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত হিন্দুই দেবী সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক হিন্দু-গৃহেই এই পূজা হয় বলিয়া ইহা অতিশয় আনন্দপ্রদ উৎসব। এই আনন্দ যিনি যতই উপভোগ করুন্ না কেন, বালকদিগের ন্যায় কেহই ইহার-আনন্দ-রস আস্বাদন করিতে পারেন না। কৃতী অকৃতী সকল ছাত্রেরই এই দিনে অপার আনন্দ। কারণ, এই দিন অনধ্যায়, লেখাপড়া নিষিদ্ধ;—কেবল আনন্দ সম্ভোগের ব্যবস্থা। যে বালকের পাঠে যত অমনোযোগিতা, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজায় তাহার তত উৎসাহ, তত মনোযোগ দেখা যায়। তাহারা ভাবে পুরোহিত-মহাশয়কে ডাকিয়া ঘটা করিয়া পূজা করিলেই তাহাদের অন্তরে সর্ব্ব-বিদ্যা প্রতিভাত হইবে। কিন্তু তাহাদিগর এই অবস্থা দেখিলে 'হারকিউলিস্ ও শকটচালকের' সেই গল্পটীর কথা মনে পড়ে। কেবল পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া পূজা করিলেই পূজা সম্পূর্ণ হয় না—জীবন দিয়া, কার্য্য দিয়া পূজা করিতে হয়, তবে পূজার ফল ফলে। নতুবা লেখা-পড়ার ধার না ধারিয়া বাহ্য পূজার আড়ম্বর করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না। সে যাহা হউক্, হিন্দুদিগের এই পূজা ঠিক কবে কোন্ সময় কাহার দ্বারা আরব্ধ হইল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা যে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ব্রহ্মখণ্ড, গণেশখণ্ড প্রভৃতিতে ইঁহার বিষয় অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে সরস্বত্যুপাখ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপে গুরুশাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া সূর্য্যের উপদেশে সরস্বতীর স্তবস্তুতির দ্বারা সেই নষ্টজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী কালে আমাদের যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা বেদের মধ্যে তাহার প্রামাণ্য অন্বেষণ করি। সরস্বতীর ইতিহাস অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমরা মূর্ত্তি-পূজার ক্রমাভিব্যক্তিও দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে সকল দেবীর

পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী দেবীর নামই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে স্ত্রী-দেবতাদিগের স্থান নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ সকল দেবতাগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উষা এবং তৎপরেই সরস্বতী। ঋগ্বেদের তিনটী সম্পূর্ণ সূক্তে এবং অন্যান্য সূক্তের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে; কিন্তু এই সকল সূক্তে যে সরস্বতীর স্তব হইয়াছে সেই সরস্বতী ও বর্ত্তমান সময়ের সরস্বতী ঠিক্ এক কি-না বলা কঠিন। পূর্ব্বের সেই বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ এই সরস্বতী-শব্দের দ্বারা ঠিক কাহাকে বুঝিতেন তাহা এই শব্দটির প্রকৃতি এবং ঋগ্‌মন্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে কতকটা বুঝা যায়। সেই যুগযুগ পূর্ব্বের আর্য্যগণ প্রকৃতির শিশু ছিলেন, সরলভাবে যাহা যেরূপ উপলব্ধি করিতেন, তাহাকে সেইরূপ সরলভাবেই প্রকাশ করিতেন। 'সরস্ এই শব্দের অর্থ জল (সৃ-ধাতুর গমনরূপ অর্থ হইতে উৎপন্ন) এবং বৎ (মতুপ্) অর্থে 'যুক্ত' বা 'অধিকারী; সুতরাং 'সরস্বৎ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত-জলবিশিষ্ট। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী হইয়াছে। বাস্তবিক ঋগ্বেদে সরস্বান্ ও সরস্বতী দুইজনের স্তব আছে, যদিও মহামতি সায়ন সরস্বান্ অর্থে মধ্যস্থানস্থিত বায়ু এবং মধ্যস্থানস্থ জলবদ্ধ বাক্- করিয়াছেন্। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে প্রভূত-জলবিশিষ্ট (নদ বা নদী) রূপেই মনে করা যায়। এই জন্য নিরুক্তকার যাস্ক 'সরঃ' কে উদক্‌পর্য্যায়ে এবং সরস্বতীকে নদী-পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন্। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে আছে।—

প্রক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথেব্য যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরন্যাঃ ॥১

অর্থাৎ—এই সরস্বতী লৌহনির্ম্মিতা পুরীর ন্যায় অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে ধারয়িত্রী হইয়া সকলের (প্রাণ-) ধারক উদকের সহিত প্রধাবিত হইতেছেন। তিনি অন্যান্য সমুদায় জলপ্রবাহকে নিজ মহত্ত্বের দ্বারা বাধা প্রদান করিয়া পথের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া গমন করিতে- ছেন্। অথবা রথী যেরূপ মার্গস্থ তরুগুল্মাদিকে চূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়, তিনিও সেইরূপ সক- লকে নিষ্পেষিত করিয়া বহিয়া যাইতেছেন্।

'একাচেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ। রায়শ্চেতংতী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ২ ॥

অর্থাৎ নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা, গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী (নদী) নাহুষের প্রার্থনা জানিয়াছিলেন্ এবং ভুবনের বহুবিধ ধন প্রদান করিতে করিতে নাহুষের জন্য দুগ্ধও ঘৃত দোহন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে দিয়াছিলেন্।

৪র্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

মিতজ্ঞুভিন্ র্নমস্যৈরিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ।

অর্থাৎ নতজানু দেবগণ প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করে। তিনি নিত্যধন- যুক্তা এবং সখাদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্ ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ "শুভ্রবর্ণে দেবি! বর্দ্ধিত হও, স্তবকারীকে অন্নদান কর।"

ঋষি বসিষ্ঠ আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন্।—

"বৃহদু গায়িষে বচোঽসূর্য্যা নদীনাং।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্ব সিষ্ঠ রোদসী ৭।৯৬।১

অর্থাৎ (হে বসিষ্ঠ) তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান

কর ; দ্যাবাপৃথিবীতে বর্ত্তমানা (অর্থাৎ 'আকাশে দেবতারূপে এবং ভূমিতে বাগ্‌রূপে স্থিতা'—সায়ন) সরস্বতীকে দোষবর্জ্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর।

উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ংতি পূরবঃ।
সা নো বোধ্যবিত্রী॥

অর্থাৎ হে শুভ্রবর্ণে (সরস্বতি) যে তোমার মহিমার দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ (দিব্য ও পার্থিব অগ্নি অথবা গ্রাম্য ও আরণ্য) অন্ন প্রাপ্ত হয়, সেই তুমি আমাদিগের রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও (বা জ্ঞান দান কর।)

"যে তে সরস্ব ঊর্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ। তেভির্নোঽবিতা ভব ।৭।৯৬।৫।

অর্থাৎ সে সরস্বান্ দেব, তোমার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতক্ষারী, সেইজলসমূহদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।"

ঋষিদিগের এই সকল স্তবস্তুতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সরস্বতী একটী অজেয় জলপ্রবাহ। কিন্তু এই সকল মন্ত্রের মধ্যে এমন সকল কথাও রহিয়াছে, যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা ইহাকে চেতনাবিহীন জল-প্রবাহ বলিয়া মনে করিতেন্ না। ইহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয়, অদৃশ্য দেবতার সাক্ষাৎকার যেন তাঁহারা পাইয়াছিলেন্। তিনি যে কেবল অন্নদাত্রী ও জলবাহিকা তাহা নহেন্, তিনি অন্নযুক্ত-যজ্ঞবিশিষ্টা, যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী (সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী ধিয়াবসুঃ—১।৪।১০), সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী (চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতংতী সুমতীনাং), এবং সকল জ্ঞানের উদ্দীপয়িত্রী (ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি—১।৪।১২)। সরস্বতীর এই যে সকল গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার বাগ্‌দেবীত্বও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয়, মহামতি যাস্ক 'সরস্' ও 'সরস্বতী' শব্দ-দুইটীকে বাঙ্‌নামপর্য্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন্ এবং বলিয়াছেন্।—

"তত্র সরস্বতী ইত্যেতস্য নদীবদ্ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।" যাস্ক, নিরুক্ত, ২।২৩।৩।

অর্থাৎ যে ৫৭ টী বাঙ্‌নাম প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যস্থ সরস্বতী-শব্দ নদীকেও বুঝায় এবং দেবতাকেও বুঝায়। ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে সরস্বতী-শব্দের দ্বারা কাহাকে বুঝিতেন্ সে-বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে জলপ্রবাহ বুঝিতেন্ তাহার আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। বেদের মন্ত্রের দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা হয়, তিনিই দেবতা (যা তেন উচ্যতে সা দেবতা); সুতরাং নদীপ্রবাহ 'দেবতা' হইবেন্ কিরূপে, এরূপ বলা যায় না। পরন্তু নদীপ্রবাহও উক্ত হওয়ায় উহা দেবতা হইতে পারেন। তবে সরস্বতীর যে সকল গুণ ও শক্তির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা প্রবাহ-মাত্রের থাকা সম্ভব কি-না, তাহাই বিবেচ্য। চেতনাবিহীন প্রবাহে চৈতন্য-বিশিষ্টের ধর্ম্মারোপ কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই সরস্বতীকে আমরা কখন কখন ইলা ও ভারতী-নাম্নী দুইটী স্ত্রীদেবতার সহিতও যুক্ত দেখিয়া থাকি। ইলা পৃথিবী, বাক্, অন্ন ও গোপর্য্যায়ের অন্তর্গত। ভারতীও বাক্-পর্য্যায়ান্তর্গত। কিন্তু ১০ম মণ্ডলে ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্রে এই তিন জনকেই আহ্বান করা হইয়াছে। সে-স্থানে ভারতীর ব্যাখ্যা হইয়াছে 'ভরতঃ আদিত্যঃ,

সর্ব্বভূতানি উদকেন বিভর্ত্তি, তস্য স্বভূতা ভাঃ' অর্থাৎ সর্ব্বভূত জল-দ্বারা পূর্ণ করেন বলিয়া ভরত অর্থে আদিত্য, ভারতী তাঁহার স্বভূতা ভাঃ অর্থাৎ দীপ্তিঃ ॥

ঋগ্বেদে সরস্বতীর এই বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেও ব্রাহ্মণের যুগে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পুরাণের যুগে ইনি সর্ব্ব-বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, বেদশাস্ত্র-যোগমাতা বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা, শাস্ত্রজ্ঞান-বাগ্‌বিভবপ্রদা ব্রহ্মপত্নী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

সরস্বতী নদী কিরূপে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন, তাহা দেখা যাক্। সরস্বতী নদী হইলেও বৈদিক যুগে তাঁহাকে বহুযজ্ঞে আহ্বান করা হইয়াছে এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে বৈদিক-যুগের আর্য্য ঋষিগণ প্রত্যেক পার্থিব বস্তুর পশ্চাতে একটি অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করিতেন এবং তাহাকেই দেবতারূপে পূজা করিতেন। কিন্তু এই সরস্বতী নদী যে তাঁহাদিগের জীবন, চিন্তা, যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে সরস্বতী নদীর তীরে সম্পাদিত বহু যজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ তাঁহারা এই স্থান অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রকৃতির শোভা, নদ, নদী, পর্ব্বত, কান্তার, শস্যশ্যামল সুবিস্তৃত প্রান্তর দেখিলে চিন্তাশীল ভাবপ্রধান মানবের মনে কত অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয়, তাহা কে না জানে? আর্য্যঋষিগণ এই নদীর তীরে বসিয়া ইহার অপূর্ব্ব জলরাশির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ইহার উপকারিতা ও গুণে মুগ্ধ হইয়া কত গীত, কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইঁহাকেই সেই সকলের প্রেরয়িত্রী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঋত্বিক্ যখন এই নদীকে তাঁহার মন্ত্রাদির প্রধান কারণ বলিয়া ধারণা করিলেন, তখন তাঁহার শিষ্য, যজমান সকলেই সরস্বতীকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন। লোকের মুখে গায়ক-সম্প্রদায়ের গীতে সরস্বতীর মহিমা এইরূপে গীত হইতে লাগিল এবং অবশেষে সকলে তাঁহাকে বাগ্‌অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া মানিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মুইরেরও এইরূপ মত।

যাঁহারা ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত তাঁহারা জানেন, প্রাচীন কালে প্রভূত জল-বিশিষ্ট নদনদীর তীরেই মানব দলবদ্ধভাবে বাস করিত এবং ক্রমে সেই সকল স্থান সুসমৃদ্ধ নগর-পল্লীতে পরিণত হইত। নীল-নদের তীরে মিশরী সভ্যতার ইউফ্রেটিস ও টায়গ্রিস্ নদীর তীরে ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার ক্রমোন্মেষে আমরা ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক্ ঐরূপ। বেদাধ্যয়নে দেখা যায়, সিন্ধু-সরস্বতী-তীরে বৈদিক আর্য্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশ হইয়াছিল। এই সরস্বতীর সাহায্যে আর্য্য অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার আদান-প্রদান করিতেন। সে-সময় কৃষিই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল এবং কৃত্রিম উপায়ে জল-সরবরাহ-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না পারায় তাঁহারা নদী-তীরেই তাঁহাদের কৃষিকার্য্য সম্পন্ন

করিতেন। নদীর প্রবাহ ও তাহার জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা পার্শ্বস্থ বিস্তৃত ভূভাগ যে উর্বর হইত তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ক্রীড়া-কৌতুকাদি সম্ভোগের জন্যও তাঁহারা নদী-তীরেই বাস করিতেন। সুতরাং কি ধর্ম্ম, কি সামাজিক জীবন, কি বাণিজ্য, কি জ্ঞানানুশীলন সমস্ত ব্যাপারেই নদীর কৃপায় সুসম্পন্ন হইতে থাকায়, নদী তাঁহাদের জীবনে অতি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং ইহা তাঁহাদের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে সরস্বতী নদী হইলেও কিরূপে বিদ্যা, জ্ঞান ও কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। জ্ঞানের সহিত সরস্বতীর এই অভেদ-কল্পনা তাঁহাকে বাগ্দেবী করিয়া তুলিল।

মানবের যাহা কিছু জ্ঞান, যাহা কিছু বিদ্যা, যাহা কিছু শিষ্টাচার-সভ্যতা, যাহা কিছু অজ্ঞানতা দূর করিবার উপায়, সে সমস্তই সেই পরম পুরুষ,—মানুষ তাঁহাকে যে নামেই অভিহিত করুক না কেন—অপূর্ব্ব কৌশলে মানবের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিশ্ব তাঁহার সৃষ্টি, এই বিশ্ব প্রকৃতিতে তিনি ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার যাহা কিছু কার্য্য তাহা এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হয়, নিরবলম্বন হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে না, এবং পারিলেও জড়দেহধারী মানব তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু এ-সকল ক্রিয়াদ্বারাও সেই মহাপুরুষ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে না। মানুষ যখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইতে লাগিল, তখন এই অপূর্ব্ব দ্বিভাব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃতি পুরুষের কল্পনা করিয়াছে। বেদান্তে এই প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং তন্ত্রে ইঁহাকেই বিদ্যা বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে যে সকল সংজ্ঞাদ্বারা ইঁহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তন্মধ্যে সরস্বতী একটি।

সরস্বতীকে বহু নামে স্তব করা হইয়াছে। তিনি বিদ্যা, তিনি মহাবিদ্যা, তিনি বিশ্বরূপা, তিনি বাণী, তিনি হৃদয়-সংস্থিতা চেতনা, তিনি অক্ষরা, নিরবলম্বা, তিনি স্মৃতিশক্তি-জ্ঞান-শক্তি-বুদ্ধিশক্তি-স্বরূপিণী, তিনি প্রতিভা-কল্পনা-শক্তি-জ্যোতী-রূপা সনাতনী। ইহা হইতে দেখা যায় সরস্বতী পার্থিব বস্তু বা কোন বিশেষ মূর্ত্তি-বিশিষ্টা নহেন।

পৌরাণিক যুগে মানুষ জ্ঞানে উন্নত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছিল সাধারণ বুদ্ধি মানবের পক্ষে তাহার ধারণা করা কঠিন। জ্ঞান উপলব্ধি করিবার বিষয়, প্রকাশ করিবার নহে। ইহা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ও সৌন্দর্য্যময়। সাধারণ মানব যাহাতে ক্রমে ইহার নিকট উপনীত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আধুনিক সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির শুভ্র বর্ণ জ্ঞানের বিশুদ্ধত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব প্রকাশ করিতেছে, হস্ত-বিধৃত বীণা, পুস্তক, লেখনী ও পদ্মযুগল এবং আসনস্বরূপা শ্বেতাম্ভোজ সাহিত্য ও শিল্প বিজ্ঞানকে

ব্যক্ত করিতেছে। * শব্দ দুই প্রকার ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বীণার দ্বারা ও বর্ণাত্মক শব্দ পুস্তকের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। হস্তস্থিত বীণার দ্বারা ইহাও বুঝান হইয়াছে যে, জ্ঞান চিত্ত-তন্ত্রীতে অহর্নিশ স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য বস্তুও তাঁহার এক একটি গুণের প্রকাশক।

সরস্বতীর স্তোত্রে আছে—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা॥

—দেবীর আসন শ্বেতপদ্ম, তিনি শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, তাঁহার বস্ত্র শুভ্র, তাঁহার অঙ্গে শ্বেত গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত, তাঁহার বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, নেত্র শুভ্র, তিনি শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিতা এবং শ্বেতলঙ্কার-ভূষিতা। তাঁহার পূজোপচার দ্রব্য নবনীত, দধি, ক্ষীর, খৈ (লাজ), শুক্ল ধান্য, শুক্লবর্ণ-পক্ক-গুড়, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত শুভ্র হবিষ্যান্ন, যবগোধূম-চূর্ণ-নির্ম্মিত ঘৃত-সংস্কৃত শুভ্র পিষ্টক, শুভ্র পুষ্প—সমস্তই শুভ্র। তিনি স্বয়ং কুন্দেন্দু তুষার-হার-ধবলা। এরূপ সর্ব্ব-শুক্লা সরস্বতীর কল্পনা আর্য্যেতর জাতির পক্ষে অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য। রূপক বলিয়া আমরা যতই ব্যাখ্যা করি না কেন, এই শুভ্রত্ব যেন সেই আর্য্যাবর্ত্ত-প্রবাহিতা যজ্ঞধূমসমাচ্ছন্না শুভ্রা সরস্বতীরই স্মৃতি-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। নদীতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই ইঁহার রহিয়াছে। পদ্ম, হংস, কচ্ছপী (বীণা) এ সমস্তই জলের সহিত সম্বন্ধ। যদিও কচ্ছপী পরবর্ত্তি-কালে সরস্বতীর করস্থিত বীণার সংজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে একটি নিগূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। এই তথ্য আমরা গ্রীক-পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাই। তথায় বলা হইয়াছে, দেবদূত হারমিস্ কচ্ছপের নাতিগভীর দৃঢ় দেহবর্ম্মের উপরে তন্ত্রী সংযোগ করিয়া বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। *

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। পদ্ম হইলেই যে তাহা শিল্পের পরিচায়ক হইবে, তাহা নহে। মানব তাহার যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করিতে চাহে তাহাকে অতিপবিত্র হৃৎপদ্মাসনে উপবেশন করায়। তাহা না হইলে তাহার তৃপ্তি হয় না—যেন পূজা অসম্পূর্ণ থাকে। সেই হৃৎপদ্মেরই প্রতিরূপক শ্বেতাব্জ।

* ভর্হুৎস্তূপ হইতে আনীত প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত বৃত্তাকার কারুকার্য্যময় চিত্রগুলি পদ্ম-ফুলেরই প্রতিচ্ছবি। সাঁচিস্তূপের পূর্ব্বতোরণের স্তম্ভগুলির উপরও পদ্মের সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। অতিপ্রাচীনকাল হইতেই পদ্ম শিল্পীগণের একটি প্রিয় বস্তু এবং সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্দীপয়িত্রী। কবিগণ পদ্মের সৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ যে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়াই তাঁহারা কাব্যে বর্ণনীয় নদীতড়াগাদির সলিলমাত্রেই পদ্মাদি-বর্ণনের নিয়ম করিয়াছেন।

* হারমিস্ দেবদূত বলিয়া বাগ্মিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বুদ্ধি-দেবতা, বীণা, বংশী, সঙ্গীত, কবিতা, জ্যোতিষ ও অক্ষরের সৃষ্টি কর্ত্তা। তাঁহার প্রিয় জীব-গণের মধ্যে কচ্ছপ একটি। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে খাদ্যোপহার দেওয়া হইত তাহার মধ্যে ধূপ ধূনা মধু ও পিষ্টক থাকিত। সরস্বতীর সহিত গ্রীক-দেবতা হারমিসের গুণের কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইনি পুরুষ উনি স্ত্রী। গ্রীকদিগের জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা (বা মিনার্ভা), দেবরাজ জিউসের কন্যা—তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূতা। সরস্বতীও এইরূপ পরমাত্মার মুখোদ্ভূতা। মিনার্ভাকে কেহ কেহ বংশীর আবিষ্কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গ্রীকদিগের দেবী আর্টিমিসের সহিত সরস্বতীর একটি সাদৃশ্য আছে। দুইজনেই ললাটে নবচন্দ্রকলাধারিণী। আর্টিমিস্ সঙ্গীত-দেবতা অ্যাপোলোর যমজ-ভগিনী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 702. February, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০২ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৮। ফেব্রুয়ারী, ১৯২২।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

অনুভব।

মরণের মাঝে কাহার আহ্বান শুনি গো প্রাণের সখা,
দিবসে নিশীথে প্রতি পলে পলে কে দেয় আমারে দেখা!
সংসারের প্রতি-কর্ত্তব্যের মাঝে শুনি কা'র প্রিয়বাণী,
বিষাদিত হ'লে কে আসি' যতনে মুছায় আনন-খানি।
ধরণীর শত শোভার মাঝারে ভাসিছে প্রতিমা কা'র,
কা'র স্নেহনদী সতত উছলে, কে সে প্রেম-পারাবার!
কে আমারে সদা করিছে আদর, নিরত বাসিছে ভাল,
তমসার মাঝে মরণের তলে কে দেয় জ্বালিয়া আলো!
আমার নয়নে আমার পরাণে জাগিছে পরশ কা'র!—
সে যে তুমি সখা, সে যে তুমি নাথ, সে তুমি জীবন-সার!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জেম্‌সের মৃত্যুদিন ঘনাইয়া আসিল। তাঁহার উপর গ্রেহাম্‌-নামক এক সামন্তের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইয়াছিল। তিনি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে রাজা একদিন পার্থ-নগরে যাইবেন বলিয়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রাণী জেন, তাঁহার সহচরীগণ ও রাজার দেহরক্ষী সৈন্য। পথে একজন পাহাড়িয়া স্ত্রীলোক তাঁহাদের নদী

পায় হইয়া পার্থে যাইতে নিষেধ করিল। রাজা তাহার কথা ভাল বুঝিতে না পারিয়া এবং বুঝার কোন চেষ্টাও না করিয়া অগ্রসর হইলেন। নগরে পৌঁছাইলে পর সন্ধ্যাকালে আবার সেই রমণী রাজার আবাস-দ্বারে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিল। তখন অসময়, সাক্ষাৎকার হইল না; রমণী আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেল,—"হায় হায়! আর রাজাকে জীবিত দেখিব না!"

ক্রমে রাত্রি হইল। রাজা প্রফুল্লচিত্তে রাণীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, পার্শ্বে সখীর দল দণ্ডায়মান। সহসা প্রাঙ্গণে মশালের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অশ্বের ঝন্ঝনা শোনা গেল। রাজা বুঝিলেন শত্রু আসিয়াছে। পাহাড়িয়া স্ত্রী-লোকটীর সাবধান-বাণী মনে পড়িল; কিন্তু তখন আর সময় নাই। দেহরক্ষী সৈন্যদল দূরে ছিল; কারণ রাজার আবাস-গৃহে স্থান হয় নাই। জেমস্ কক্ষগুলির দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারি-গণের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতক ছিল। তাহারা দ্বারের অর্গলগুলি সরাইয়া রাখিয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা কক্ষতলের একখণ্ড তক্তা তুলিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। ডগ্‌লাস্-বংশের ক্যাথারিন্ নামে এক রমণী এইবার প্রভুভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কক্ষদ্বারের লৌহ অর্গল ছিল না, তিনি আপন হস্ত অর্গলের পরিবর্ত্তে নিয়োজিত করিলেন। সে দুর্ব্বল হস্ত শোণিত-পিপাসু বিশ্বাসঘাতকের প্রবেশ-রোধ করিতে পারিল না। দ্বার খুলিয়া গেল; ক্যাথারিন্ অচৈতন্য হইয়া ভগ্ন-রক্তাক্ত-হস্তে পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।* রাণী হত্যাকারিগণকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও আহত হইলেন।‡ কেহ কেহ তাঁহাকেও হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রেহামের পুত্র বলিলেন, "রাণীকে হত্যা করিয়া কি হইবে? রাণী স্ত্রীলোক। রাজাকে খুঁজিয়া বাহির কর।"

হত্যাকারীর দল রাজাকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। গোলযোগ শুনিতে পাইয়া রাজার দেহরক্ষিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। বিশ্বাসঘাতকগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; তাহারা পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণ-রক্ষা হইল না। ভগবানের দেওয়া শাস্তি আসিতে বিলম্ব করে, কিন্তু সে শাস্তি এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই আসে। এ-ক্ষেত্রে শাস্তি অতিশীঘ্র আসিল। ষড়যন্ত্র-কারিগণ পলায়নের সময় আক্ষেপ করিয়াছিল যে, তাহারা রাণীকে হত্যা করে নাই। রাণী এইবার ভগবানের দণ্ডের অস্ত্র হইলেন। প্রতিহিংসার তীব্রজ্বালায় তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। যে অনল তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছিল, তাহাতে হৃদয়ের নারীসুলভ কোমলবৃত্তি-গুলি পুড়িয়া ছাই হইল। হত্যার অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকগণের অধিকাংশ ধৃত

---

* কবি রোসেটি তাঁহার 'কিংস্ ট্রেজেডি' ('রাজার বিয়োগ') নামক কাব্যে ক্যাথারিণের মুখ দিয়া ঘটনাটি বলাইয়াছেন।

‡ মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে জেমস্ তাঁহার কবিতা-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পত্নীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "(যিনি) স্বামীর প্রাণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" মানবের কল্পনা কখন কখন এইরূপ বাস্তবে পরিণত হয়।

হইল এবং যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করিয়া অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদের প্রাণবধ করা হইল।

ক্যাথারিন্ ডগলাস্ পরে আলেকজাণ্ডার লভেল্-নামক এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। রাজার প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য "বার্" অর্থাৎ অর্গল-রূপে আপন হস্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ডগ্‌লাস্ বংশের এই সাহসী বিশ্বস্ত দুহিতাকে 'ব্যারল্যাস্' বলিত। তাঁহার বংশধরগণ স্কট্‌লণ্ডে ব্যারল্যাস্ উপাধি ধারণ করিতেছেন। তাঁহাদের শীল-মোহর, যান, বসন, ভূষণ প্রভৃতিতে বংশ-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ একটী ভগ্ন হস্ত অঙ্কিত রহিয়াছে।

প্রথম জেম্‌সের পর জেম্‌স্ নামে কয়েক জন রাজা পর পর স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের বংশকে ষ্টুয়ার্ট বংশ বলা হয়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রবার্ট ব্রুসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্কট্‌লণ্ডের রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ফলে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসনে বসিবার অধিকার পান।

স্কট্‌লণ্ডের রাজা পঞ্চম জেম্‌স্ ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে রোগ-শয্যায় শয়ন করেন। সেই শয্যাই তাঁহার অন্তিম শয্যা। রাজা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, রাণী একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজার বড় আশা ছিল যে, পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র তাঁহার অবর্ত্তমানে সিংহাসনে বসিবে। কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "আমাদের রাজমুকুট রমণী হইতেই আসিয়াছিল, রমণীর সহিতই তাহা চলিয়া যাইবে।" মরণ-পথের যাত্রী রাজার আশঙ্কা আংশিকভাবে ফলিয়াছিল।

রাজকন্যা মেরী কুক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতুল রূপগুণের অধিকারিণী হইয়াও তিনি জীবনে অতি অল্প দিনই সুখ-ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন শিশু, তখনই তাঁহার জন্য স্কট্ ও ইংরাজ, দুই জাতির মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ইংলণ্ড হইতে এক-দল সেনা প্রেরিত হইল,—ইচ্ছা, রাণী মেরীকে লইয়া গিয়া ইংলণ্ডের বালক রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইবে। স্কট্‌দিগের এ বিবাহ-দানে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু এরূপ সশস্ত্র ঘটকদল দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়াও ইংরাজসৈন্য রাণীকে পাইল না। স্কটেরা জাহাজে করিয়া তাঁহাকে ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিল। ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া ফ্রান্সের সহিত স্কটলণ্ডের বরাবর মিত্রতা ছিল। আর মেরীর মাতা নিজে ফরাসী-দুহিতা ছিলেন। যে কয়েক বৎসর মেরী ফরাসী-দেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই কয়টিই তাঁহার সুখের বৎসর।

সেকালে তাঁহার তুল্য রূপবতী মহিলা দেখা যাইত না। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় অহঙ্কারের লেশ থাকিত না। তিনি কয়েকটি বিভিন্ন ভাষা জানিতেন এবং রাজকার্য্য বেশ বুঝিতেন। তিনি অশ্বারোহণে পটু ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে সাহসের অভাব ছিল না। এক সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যদি তিনি পুরুষ হইতেন, তাহা

হইলে বর্ম্ম-চর্ম্ম ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেন।

মেরী যখন স্কটলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশের লোক তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিল। শৈশব ও যৌবনের 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' সোণার ফরাসী-দেশ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার প্রাণে যে ব্যথা জাগিয়াছিল, স্বদেশে প্রজাগণের মধ্যে আসিয়া তিনি তাহার কিছু ভুলিলেন। সকলের অনুরোধে তিনি আবার বিবাহ করিলেন। এই বিবাহই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার স্বামী উচ্চবংশের সন্তান ও রূপবান্ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর অতিনীচ ছিল। স্বামি-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিল; স্বামী কতকগুলি সামন্ত একত্র করিয়া মেরীর চক্ষুর সম্মুখে মেরীর এক প্রিয় কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করাইলেন। হত্যা-কারিগণের উপর রাণীর দারুণ রোষ হইল। তিন মাস পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হয়। এই শিশু ভবিষ্যতে ষষ্ঠ জেমস্ নামে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হন্ এবং পরে ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্ হইয়া দুইটি দেশকে এক রাজচ্ছত্রের অধীন করেন।

রাজার মঙ্গলের জন্য মেরী অধিকাংশ হত্যাকারিগণকে ক্ষমা করেন। কিন্তু স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ঘুচিল না। তাঁহার স্বামীর অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। লোকে তাঁহার স্বামীর হত্যাকারী বলিয়া যে সামন্তকে সন্দেহ করিল, তিনি একদিন মেরীকে পথিমধ্যে বন্দী করিয়া আপন দুর্গে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে মেরী সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করিলেন। প্রজাগণ রাণীর উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইল। সকলে নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিল। এখনও সে সন্দেহ-ভঞ্জন হয় নাই এবং মেরীর অপরাধ কতটুকু এখনও তাহা ভালরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ফলে, সুলতানা রিজিয়ার ন্যায় মেরী সিংহাসন-চ্যুত হইলেন; তাঁহার জীবন-হানি হইল না। তাঁহার শিশুপুত্র স্কটলণ্ডের রাজা হইলেন।

মেরী বন্দিনী অবস্থায় কিছুকাল বাস করিয়া পলায়ন করেন * এবং কতিপয় অনুগত সামন্তের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় ল'ন। ইংলণ্ডে বন্দিনী-রূপে উনিশ-বৎসরকাল থাকার পর ইংলণ্ডের রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। যিনি আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ডের রাণী উদারতার পরিচয় দেন নাই। মেরীর শেষ জীবনের করুণ দুঃখকাহিনী পাঠ করিবার সময় তাঁহার গত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির কথা মনে থাকে না। বীরবংশে তাঁহার জন্ম। মৃত্যুকালে তিনি যে নির্ভীকতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা সেই বীরবংশের দুহিতারই উপযুক্ত।

কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ডের রাণীর মৃত্যুর পর মেরীর পুত্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বহুবৎসর পরে ইংলণ্ডের শেষ ষ্টুয়ার্ট রাজা বিতাড়িত হ'ন। তাঁহার পুত্র-পৌত্র পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্য উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় স্কটলণ্ডে আগমন করেন। ইংলণ্ড ও

---

* ঔপন্যাসিক স্যর্ ওয়াল্টার স্কট্এর 'অ্যাবট' (মঠাধ্যক্ষ) নামক উপন্যাসে মেরীর জীবনের কতক অংশ দেখান হইয়াছে। কবি সুইন্‌বার্ণ তাঁহার নাটকে মেরী ষ্টুয়ার্টের জীবন চিত্রিত করিয়াছেন।

স্কটলণ্ড তখন বর্ত্তমান রাজবংশের অধীনে। রাজপুত্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। * ইংলণ্ডের সরকার ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কেহ রাজপুত্রকে ধরাইয়া দিতে পারিলে ত্রিশ হাজার মোহর পুরস্কার পাইবে। রাজপুত্রের পক্ষ হইয়া যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইতেছিল। রাজপুত্রের জীবন রক্ষা করিলেন একজন রমণী। চারিধারে রাজপুত্রের জন্য অন্বেষণ চলিতেছিল। তিনি রাজপুত্রকে আপনার অনুচরীর বেশে সাজাইয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ স্থানে পৌছাইয়া দিলেন। ইহাতে তিনি যথেষ্ট সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আর একজন ভদ্রলোক তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে সেই ভদ্রলোক তাঁহার স্বামী হ'ন। এই রমণীর নাম ফ্লোরা-ম্যাক্‌ডোনাল্ড্।

রাজপুত্র রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার পলায়নের সহায়তা করার অপরাধে ফ্লোরা-ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ লণ্ডন-দুর্গে কিছুদিন আবদ্ধ থাকেন। তিনি মুক্তিলাভ করিলে পর, বিলাতের ষ্টুয়ার্ট-বংশের প্রতি অনুরক্ত সমস্ত লোক তাঁহাকে সম্মান দেখাইতেন। ইংলণ্ডের তখন যিনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, তিনিও আপন পত্নীর নিকট এই মহৎ কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি সেই হতভাগ্য রাজপুত্র ঐপ্রকার বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট আসিত, তবে তুমিও কি ঐরূপ করিতে না? আমি নিশ্চয় জানি, তুমিও ঐরূপ করিতে।" যে মহানুভব রাজকুমার শত্রুর প্রাণরক্ষাকারীর সম্বন্ধে এইরূপ মহৎ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রপিতামহ।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

* স্যার্ ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভার্লি' নামক উপন্যাসে যুবরাজের যুদ্ধকাহিনীর কতক অংশ বর্ণিত আছে।

স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

জন্ম-পত্রিকা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৩) ভাগ্য, ধর্ম্ম, ভক্তি, তপস্যা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।—এই কয়টী ভাবই এই মহাত্মার জীবনের অতীব উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বিষয়ে এ-স্থলে একটু বিস্তৃত বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

(ক) ভাগ্য :—"চন্দ্রাদ্ বিলগ্নান্নবম্ নিরুক্তং ভাগ্যালয়ং * * ..." (ইতি শম্ভু-হোরায়াম্)। চন্দ্র ও লগ্নের নবম স্থানে ভাগ্যের বিচার হয়। চন্দ্র লগ্নস্থ হওয়াতে চন্দ্র ও লগ্ন হইতে নবম ভাব একই রাশি। বর্ত্তমান স্থলে উহা বৃষরাশি। নবম ভাবের অধিপতি শুক্র পঞ্চম ভাবস্থ, বলবান্ উচ্চনবাংশস্থ এবং অধিমিত্র-ক্ষেত্রস্থ। নবমভাবে বুধ ও বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি বিদ্যমান। উহাতে অন্য কোন অশুভ গ্রহের বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই। অতএব নবমস্থান অতি নির্ম্মল ও মনোরম। পরন্তু

"শুভং বর্গোত্তমে জন্ম বেশিস্থানে চ সদ্‌গ্রহে। অশূন্যেষু চ কেন্দ্রেষু কারকাখ্যগ্রহেষু চ॥ (বৃহজ্জাতকঃ)-এ স্থলে কেন্দ্রে চন্দ্র, মঙ্গল, রবি ও শনির অবস্থান হওয়াতে,—বিশেষতঃ—"নিধন-ত্রিত্রিকোণ-সুতোপগশ্চেদ্ বলান্বিতো যে নবমং প্রপশ্যেৎ। যস্য প্রসূতৌ স তু ভাগ্যশালী সুবর্ণ-সংযুক্ত-বিলাসশীলঃ॥"—(শম্ভুহোরায়)-এ-স্থলে লগ্ন, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান বলবান্ গ্রহ-যুক্ত এবং ভাগ্যস্থান বলবান বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র-দৃষ্ট হওয়াতে এই মহাত্মার ভাগ্য-ভাবের নিষ্কলত্ব ও মনোহারিত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।* এই বিশিষ্ট ভাগ্যযোগ হইতে এই মহাত্মার জীবনে অনেক বিশিষ্ট ও সুমিষ্ট ফল সম্ভূত হইয়াছে। এই ভাগ্য হইতেই ধর্ম্ম, ভক্তি ও তপস্যার উৎপত্তি; এই ভাগ্য হইতেই ধন, সম্মান, যশঃ ও প্রভুত্বের উৎপত্তি এবং এই ভাগ্য হইতেই সাধনা, বিশ্বপ্রেম এবং সিদ্ধির উৎপত্তি।—

"ভাগ্যাদেব তু শাস্ত্রসিদ্ধির্ভাগ্যাচ্চ ধনাগতৌ। যশাংসি ভাগ্যতো ভাগ্যবিপর্য্যাসাদ্ বিপর্য্যয়ঃ॥" 'পরাশরঃ'

এইগুলি একটী একটী করিয়া বিবৃত করিতেছি।

(খ) ধর্ম্ম ও ভক্তি।—নবম বা ভাগ্য-ভাবে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পঞ্চমে ভক্তির বিচার হয়। বৃহস্পতি ধর্ম্ম ও ভক্তির কারক। ভাগ্যভাবের নিষ্কলত্ব ও উৎকৃষ্টত্ব ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বৃহস্পতি কেমন মনোরম দেখুন।—বৃহস্পতি অধিমিত্র-ক্ষেত্রস্থ; সম্পূর্ণ মিত্রবর্গগত; স্বদ্রেক্কাণ-নবাংশ-ত্রিংশাংশগত; বর্গোত্তম-নবাংশস্থ; শুভগ্রহ বুধযুক্ত; কোনও অশুভগ্রহের দৃষ্টিযুক্ত নহে॥—

"শনী দৃকাণে রবিজেন সংস্থিতঃ কুজাদিদৃষ্টঃ প্রকরোতি তাপসম্॥" ইতি জ্যোতির্নিবন্ধে।

এ-স্থলে চন্দ্র শনির দ্রেক্কাণস্থ হইয়া মঙ্গল-যুক্ত এবং শনি-কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হওয়াতে এই মহাত্মার তাপস-যোগ হইয়াছে। বিশেষতঃ—"বলযতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপযাতে শুভ-শতমুপযাতি স্বামি-দৃষ্টে বিলগ্নে। সুরগুরু-নব-ভাগ-ত্রিংশদংশ-ত্রিভাগে দশম-ভবনগে বা বীত-ভোগস্তপস্বী॥" (ইতি জ্যোতির্নিবন্ধে)। এস্থলে নবমপতি বলবান্ শুক্র কোণস্থ এবং দশমপতি বুধ বৃহস্পতির দ্রেক্কাণ ও ত্রিংশাংশ-গত। কিন্তু লগ্নে লগ্ন-পতির কোন দৃষ্টি নাই। অতএব এই যোগজ ফল সম্পূর্ণ না হইলেও এই মহাত্মা যে অনেক পরিমাণে ভোগস্পৃহাহীন ও তপস্বী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই যোগটী সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হইয়াছিল; এজন্য তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বীতভোগ ও তপস্বী হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চমে ভক্তির বিচার হয়। ধর্ম্মপতি শুক্র ভক্তিস্থানস্থ। আর ভক্তিপতি শনি কেন্দ্রস্থ এবং সত্ত্বগুণী রবি-যুক্ত; কিন্তু অস্তগত ও নীচনবাংশস্থ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি শুভগ্রহ দ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে উক্ত দোষের অনেকটা হানি হইয়াছে। ভক্তি-কারক বৃহস্পতি অতি-শুভ এবং নানাগুণে বিভূষিত। পরন্তু—

"গুরুর্দর্কঃ বিনা মন্ত্র-মিত্রাশনাভ্যামধীতেন কিং"—(ইতি চমৎকারচিন্তামণি)। এবং "শুভেশে মাতৃভবনে চিরং মাতা সুখং ভবেৎ। লক্ষীযুক্তঃ সুবুদ্ধিশ্চ সচিবশ্চাথবা গুরুঃ॥—(পরাশরঃ) এবং,—"ভাগ্যেশে পঞ্চমে জাতে ভাগ্যবান্ জনবল্লভঃ। গুরুভক্তিরতো মানী ধীরো ধীরঞ্জনেষু তঃ॥" (পরাশরঃ)।

এই সকল যোগের দ্বারাও জপ-ধ্যানাদি-দ্বারা ইষ্টলাভ, ভক্তিমত্তা, ধর্ম্ম-গুরুর পদলাভ

প্রভৃতি সূচিত হইতেছে। এই মহাত্মার ধর্ম্ম ও ভক্তি-ভাব যে অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর প্রবাহের ন্যায় শয়নে কিংবা জাগরণে, গৃহে কিংবা কার্য্যক্ষেত্রে, ভ্রমণে কিংবা উপবেশনে, সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও ভক্তির স্রোতঃ সংগোপনে তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত থাকিত। ধর্ম্মপতি শুক্র অশুভ-মধ্যবর্ত্তী এবং ভক্তিপতি কঠোর তপস্বী শনি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল ও ভক্তিস্থান অশুভ-মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে তিনি ভক্তগুরু চৈতন্যাদির ন্যায় অহেতুকী ভক্তি লাভ করিতে না পারিলেও, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রের এই ভক্তের লক্ষণগুলি অনেক পরিমাণে তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, উপনিষদ্ ও গীতার অনেক শ্লোক তাঁহার হৃদয়ের মন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছিল। তিনি এত ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। ইহা ভিন্ন ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইত।

(গ) ধর্ম্মোপদেশ, সাধনা ও তপস্যা।—প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সংসারের আব্‌হাওয়া ও উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়াতে সেগুলি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রস্ফুটিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মহাত্মাও ধর্ম্ম ও ভক্তির উৎকৃষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রও সে বীজ ধারণ ও পরিপোষণের অনুকূল অনেক সার সদ্‌গুণ ধারণ করিত। সে সকল গুণের বিষয়ও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু উৎকৃষ্ট বীজ এবং উর্ব্বর ক্ষেত্র হইলেই হয় না। অভিজ্ঞ ও যত্নশীল কৃষক, জল, বায়ু ও উত্তাপের আবশ্যক। এই মহাত্মার উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও ভক্তির সেই উৎকৃষ্ট বীজ ব্রহ্মানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অপরাপর ক্ষুদ্র বৃহৎ ধর্ম্মাচার্য্যদের যত্নে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ, শাস্ত্রালোচনা এবং সংসর্গের জলবায়ু ও উত্তাপে সুমধুর ও সুগন্ধ ফলফুল-শোভিত অতিমনোরম বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মহাত্মার তাপস-যোগ হইয়াছিল। পরন্তু

"শুভগ্রহাণাং ভবনে তু তস্মিংস্তৃতীয়রাশৌ শ্রবণং কথানাম্। পুণ্যাদিকানাং যদি পাপরাশৌ ক্রূরস্তৎকর্ণ-কুঠারমাহুঃ॥" —(জাতক-পারিজাত)।

এই বচনানুসারে ইঁহার পুণ্যকথাদি-শ্রবণ-যোগ হইয়াছে। এই মহাত্মা পুণ্যকথাদি-শ্রবণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় এত আনন্দ ও সুখানুভব করিতেন যে, তাঁহাকে কখনও এ-বিষয়ে অলস হইতে দেখি নাই। তিনি একজন কঠোর সাধক ও তপস্বী ছিলেন।

(ঘ) সিদ্ধি ও বিশ্বপ্রেম।—সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। যাহার যতটুকু সাধনা, তাহার ততটুকু সিদ্ধি। অর্থাৎ যতটুকু সাধনা, অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি ততটুকুই পরিস্ফুটিত ও পরিপুষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই মহাত্মার অন্তর্নিহিত ভক্তি ও ধর্ম্মের শক্তি কীদৃশী বলবতী ছিল। সেই প্রবলা শক্তি সাধনা ও তপস্যার দ্বারা প্রবুদ্ধা ও পরিপুষ্টা হইয়া একটী মহাশক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

সেই শক্তির সম্মুখে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, বিপদ্-দুঃখ, মায়া-প্রলোভন চূর্ণ হইয়া যাইত। তিনি সিদ্ধিলাভ না করিলেও (তাহার) অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বিশ্ব-প্রেম সিদ্ধির সহচর। যাঁহারা মুক্ত ও সিদ্ধ, তাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক। কেন না, সংসারের ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন আর তাহাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"—তাঁহাতে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই ভগবানের পূজা। ইহাই মুক্ত ও সিদ্ধপুরুষদের হৃদয়-মন্ত্র। তাঁহার পরিচিত সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে ভক্তি ও পূজা করিত। অনেক গোঁড়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে তাঁহার পদধূলি লইতে দেখিয়াছি। মহা শাস্ত্রজ্ঞ উপবীতধারী বৈদ্যবংশীয় ব্যক্তিকে তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে দেখিয়াছি। অনেক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ" এই আখ্যা দিতে সংকোচ বোধ করিতেন না। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভক্তি ও আগ্রহ-সহকারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ-সকল বিশ্বপ্রেমের ফল॥

(ঙ) বৈরাগ্য।—সংসারের অনিত্যতা-বোধ ও তজ্জন্য উহাতে অনাসক্তির নামই বৈরাগ্য। আমাদের একটা কুসংস্কার আছে যে, সংসার পরিত্যাগ না করিলে বৈরাগ্য-লাভ হইতে পারে না। কিন্তু এই মহাত্মার জীবন উহার ব্যতিক্রম। তিনি সংসারে থাকিয়াই বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার যে প্রব্রজ্যা বা বৈরাগ্য-যোগ হইয়াছে, এ-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি এ-স্থলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

"শশী সুকাপে রবিজস্ত সংস্থিতঃ।
কুজার্কিদৃষ্টঃ প্রকরোতি তাপসম্॥" (ইতি জ্যোতির্নিবন্ধে)

চারিটী গ্রহ কেন্দ্রবর্ত্তী হওয়াতেও বৈরাগ্য-যোগ সূচিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েন্ নাই। তাহার কারণ, লগ্নপতি বুধের সহিত বলবান্ ও সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন সুধাধিপতি বৃহস্পতির সংযোগ। এই সংযোগ তাঁহাকে সংসারের সুখ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে প্রবৃত্তি দান করে নাই। বিশেষতঃ—

"নিশার্দ্ধাচ্চ দিনার্দ্ধাচ্চ পরং সার্দ্ধদ্বিনাড়িকা।
শুভা তদুদ্ভবো রাজা ধনী বা তৎসমোঽপি বা॥" (পরাশর)

এই পরাশরোক্ত বচনানুসারে এই মহাত্মার মধ্যরাত্রির পর ২॥ দণ্ডের মধ্যে জন্ম হওয়াতে রাজযোগ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ-যোগ হইয়াছে। যে-স্থলে রাজযোগ ও সন্ন্যাস-যোগ এই উভয়ই হয়, সে-স্থলে মানুষ উভয়-যোগের ফলই ভোগ করে। অর্থাৎ সাংসারিক সম্মান, যশঃ, ভোগ-সুখাদি প্রাপ্ত হইয়াও অন্তরে পরম বৈরাগ্য লাভ করিয়া পরমার্থপরায়ণ হয়। এই মহাত্মার জীবনও তদ্রূপ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনও উহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার রাজযোগ ও সন্ন্যাসযোগ এই দুই-ই অতিপ্রবল ছিল॥

(চ) সম্মান, খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি।—ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই মহাত্মার রাজযোগে জন্ম হইয়াছে। এই রাজযোগ-সম্মান, প্রভুত্ব-ও ঐশ্বর্য্য-যোগ। কিন্তু সন্ন্যাসযোগ হওয়াতে তিনি এই সকলের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তথাপি, সর্ব্বত্রই উক্ত সম্মান ও প্রভুত্ব লাভ করিতেন। তিনি সকলপ্রকার বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন; তথাপি অন্তরে বৈরাগ্য ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম করি-

তেন্। তিনি বিষয়াসক্ত হইলে বিষয়-রাজ্যে যে একজন অতি খ্যাত্যাপন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী লোক হইতে পারিতেন্, তাহার আর সন্দেহ নাই।

(ছ) ধর্ম্ম ও ভক্তির বিশেষত্ব।—এই মহাত্মা বিশেষ স্বদেশ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও ভক্তিভাবেও তাহার অনুপ্রাণনা দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধনাপ্রণালী বহুপরিমাণে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা-প্রণালীর অনুরূপ ছিল। তিনি যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং স্বকীয় আচরণে দেশীয় ভাব রক্ষা করিতেন্। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহাকে গীতা ও উপনিষদাদিষ্ট-পথাবলম্বী সাধক বলা যায়। এইরূপ স্বদেশীয় ভাবপ্রিয়তা বৃহস্পতির ফল। বৃহস্পতি সত্ত্ব-গুণী ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ কিন্তু স্বদেশীয়-ভাব-রক্ষক (conservative)। বৃহস্পতি ধর্ম্মভাবের পূর্ণদর্শী হওয়াতে এই মহাত্মাও পূর্ব্বোক্তভাবাপন্ন হইয়াছেন্।

(১৫) এই মহাত্মার অন্যান্য গুণ-সম্বন্ধে নিয়ে প্রাশ্চাত্য জ্যোতিষ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—

"In any aspect (between Sun and Saturn) tends to give a strong personality, one who goes his own way irrespective of the feelings or desires of others, who is not affected by the protests or opinions of others, and who is with difficulty thwarted or turned aside. He is capable of organising, controlling, governing and directing others. He is to some extent a natural leader; is subtle, often most so when seeming to be frankest, and does not mind isolation or positions of responsibility. He is ambitious and if the fire and energy of Mars are added to the subtlety and controlling power of Saturn, nothing can turn him aside; he will work out his purposes successfully in the face of the greatest obstacles and is certain to obtain leadership or mastery over others and positions of prominence or responsibility, even though in a small sphere. There is a tendency to pride, dignity and isolation and to whatsoever lifts a man up or separates him from his fellows."—
Alan Leo, How to Judge A Nativity,
Part II, P. 71

অর্থাৎ—রবি ও শনির মধ্যে দৃষ্টি কিংবা সংযোগ-জন্য কোনও সম্বন্ধ হইলে, জাতক অতি তেজস্বী পুরুষ হয়; সে অপরের ভাব কিংবা ইচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে চলিয়া যায়; অপরের মত কিংবা প্রতিবাদ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; অতি-কষ্টে তাহাকে বিফল-মনোরথ অথবা নিবৃত্ত করিতে পারা যায়। সে অপরের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন, অন্যকে সংযত, শাসিত ও পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। সে অনেক-পরিমাণে স্বভাবতঃ সমাজের নেতা এবং সুকৌশলী হয়। সে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় না, কিংবা অন্যকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইলেও তাহা গ্রাহ্য করে না। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় এবং শনির কৌশল ও পরিচালন-ক্ষমতার সহিত মঙ্গলের কার্য্যশক্তি যুক্ত হইলে, অতীব কঠিন বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও সে নিজের উদ্দেশ্য-সাধনে সক্ষম হয় এবং নিশ্চয়ই নেতৃত্বও প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকে। সে অনায়াসেই উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হয়। আত্ম-

২

প্রসাদ আত্মসম্মান, নির্জ্জনবাস, কিংবা যাহাতে মানুষকে অন্যাপেক্ষা উচ্চ করিয়া তুলে, সেই দিকে সর্ব্বদাই তাহার চিত্ত ধাবিত হয়।"

এই মহাত্মার রবি ও শনির সংযোগ পূর্ণ হইয়াছিল, এবং মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হওয়াতে মঙ্গলের কার্য্যশক্তি উক্ত যোগজ ফলকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহার জীবনে পূর্ব্বোক্ত গুণসকল পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্ম ও ভক্তি-ভাব অতি প্রবল হওয়াতে উক্ত গুণ-সকল সংযত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সাধুতা- ও মুক্তি-লাভের সহায় হইয়াছিল।

এই স্থলে এই মহাত্মার চরিত্রাঙ্কন সমাপ্ত হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

জন্মভূমির জয়-গান।

[রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী]

জয়, জননি জনমভূমি!
আর্য্য-বীর্য্য-শৌর্য্য প্রসূতি, রমণীয়া শিরোমণি!—
স্মৃতি-মহিমায়, প্রীতি-জ্যোতিঃ ভায়, অতীত-পুলক-কাহিনী;
চির অভিনব তব গৌরব, চেতনা-আলোক-বাহিনী!
শোণিত-প্রবাহে, সম্ভ্রমে বহে তব সম্মান ধমনী!—
সে কি ভুলিবার, ওগো মা আমার, সে কি ভুলিবার জননি!
আশীষ মা রণ-রঙ্গিণি আশীষ মা রণ-রঙ্গিণি,
শ্লাঘার মরণে হোক্ শোভাময় সন্তান-চয়-জীবনী!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

কলিঙ্গড়া—রূপক।

৩ ১ ২ ০ ১ ২
II গা -া মা। পা -া। দা পদা I পা মা গা। গা -মপা। মগা -ঋসা I
জ ০ য় জ ০ ন নি০ জ ন ম ভূ ০০ মি০ ০০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I গা -মা পদা। না -সা। র্সা। I ঋ্র্ঋা -র্সা র্সা। র্নর্সা ঋা। -র্সা না I
আ র্ য্য০ বী র্ য্য ০ শউ র্ য্য প্র০ সূ ০ তি

০ ১ ২ ০ ১ ২
I নর্সা না না । দা -া । পা -দা I পা মা গা । ঋা -সা । সা -া II II
ঙ্গ ৽ য় জ ন ৽ নি ৽ জ ন ম ভূ ৽ মি ৽

দু'টি শুদ্ধ { } বন্ধনীর আর দু'টি বক্র [ ] বন্ধনীর মধ্যে স্থাপিত পংক্তিক'টী, স্বরলিপি অনুযায়ী বিভিন্ন বাটে গেয়। প্রথম বার শুদ্ধ-বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সুরে, আর দ্বিতীয় বার বক্র-বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সুরে গাইতে হ'বে। কোন ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলনীর সাময়িক অধিবেশনে, মিলিতকণ্ঠে বালকবালিকাগণ এ গানখানি গাইলে, শ্রুতি-মধুর হ'বে বলে আমার বিশ্বাস। —লেখিকা।

সোণার হার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মধুরাও যখন মুদ্‌কল ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। সম্মুখে কৃষ্ণমৃত্তিকাচ্ছাদিত কঠিন প্রান্তর;—যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কাননের শ্যামল শোভা দেখা যায় না।—কোন কোন স্থানে ছোট ছোট ক্ষুদ্র প্রস্তর-স্তূপ,কোথাও বা দুই একটি কাঁঠাল বা আম্র-বৃক্ষ। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আকাশে কিরণ দিতেছিলেন, কিন্তু বৎসরের মধ্যভাগ বলিয়া উত্তাপ অসহনীয় নহে। মধুরাও একবার সতৃষ্ণনেত্রে পশ্চাতে চাহিয়া আপন-মনে অশ্ব-চালনা করিতে লাগিলেন। মুদ্‌কলের প্রান্তদেশে তখনও কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়াইয়া। দূরে একটি আম্রবৃক্ষের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া কুলবর্গের সেই সম্ভ্রান্ত সৈনিক বিজয়নগর-সেনার প্রস্থান নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবা সহচরকে বলিলেন, "আজিম! তুমি এখনি এই অঙ্গুরীয়ক লইয়া রায়চূড়ে যাও। খাঁ-সাহেবকে বলিবে, তিনি যেন মুদ্‌কলে পঞ্চশত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। আজ হইতে তৃতীয় দিনে যেন তাহারা এখানে উপস্থিত হয়। বাক্যব্যয় করিও না, এখনি যাও। তুমি না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত শিকার বন্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও।" অনুচর কুর্ণীশ করিয়া চলিয়া গেল। চিন্তাকুলহৃদয়ে যুবকও আপনার শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রীতা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সৈনিকের কথাই ভাবিতেছিল; ভাবিতেছিল, মানব এত সুন্দর হইতে পারে! সেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যুবার মূর্ত্তি তাহার অন্তরপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। গৃহকর্ম্মে মন লাগিতেছিল না। স্নেহের গোবৎসগুলি ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করিতেছিল—আজ ত একটি পরিচিত হস্তের কোমল স্পর্শ তাহাদের নিকট পৌঁছায় নাই! প্রীতার মাতা একবার তাহাদিগের নিকট গেলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, প্রভাতের ঘটনা কন্যার মন বিচলিত করিয়া দিয়াছে, তাই ইহাদের এত অনাদর। কৃষক

তিস্মা বাহিরে গ্রামবাসিগণের সহিত কথোপ-কথনে ব্যস্ত।

পরদিন প্রীতার বাহ্য স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিল, কিন্তু অন্তর পূর্ব্ববৎ অস্থির। সে কার্য্য করিতে করিতে এক একবার দ্বারপথে দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করিতেছিল; আশা—যদি সে মোহন-মূর্ত্তি কার্য্যব্যপদেশে কুটীর-সম্মুখ দিয়া গমন করে। তাহাকে কে যেন বলিতেছিল, "আসিবে, সে এখনি আসিবে।" কিন্তু কই! সে ত আসিল না। পরদিনও এইরূপে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে তিস্মা একটি পুরুষের সহিত গৃহে প্রবেশ করিল;—বলিল "প্রীতা, জল আন, বিজয়নগরের রাজপুরো-হিত ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য আসিয়াছেন,—আজ বড়ই সৌভাগ্য! চরণ ধুইয়া দাও।" প্রীতা জল আনিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ ব্যগ্রতা ছিলনা। সে ভাবিতেছিল, 'বিজয়নগর হইতে এ ব্রাহ্মণ এলেন কেন? আবার কি সেই কথা উঠিবে? কি বিড়ম্বনা!' ওষ্ঠ দৃঢ় নিবদ্ধ করিয়া সে পিতার আদেশ পালন করিতে গেল। সহসা লোকচার্য্য তিস্মাকে বলিলেন, "বাহিরে কিসের গোলযোগ, তিস্মা?" কৃষকের মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। সে জানিত না যে গ্রামের প্রান্তরে হিন্দুমুসলমানে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে, আর সে যুদ্ধের কারণ তাহার কন্যা। সুতরাং সে বলিল, "গ্রামের সকলে আমোদ করিতেছে।" প্রীতা একটি পাত্রে জল লইয়া আসিল। ক্ষীণ দীপালোকে ব্রাহ্মণ প্রীতাকে দেখিলেন এবং পদধৌত না করিয়া তিস্মাকে আলোকটি নিকটে আনিতে বলিলেন। প্রীতা তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাতখানি লইয়া প্রদীপের নিকট ধরিলেন, কিয়ৎক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরী-ক্ষণ করার পর বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! রাজ-পুত্রবধূ—।" মুখের কথা শেষ হইল না। অনতি-দূরে গ্রামবাসীর ভয়বিহ্বল আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। তিস্মা বলিয়া উঠিল, "শত্রু আসিয়াছে। ঠাকুর কি হইল!" লোকাচার্য্য বলিলেন, "পারিলাম না, সব ব্যর্থ হইল। তিস্মা! ভীত হইও না। বনের মধ্যে সেই মন্দির আছে, সেই খানে গিয়া আশ্রয় লও, কেহ জানিতে পারিবে না। প্রীতা পিতার পার্শ্বে আসিয়া কহিল, "আর আপনি?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার জন্য ভাবিও না, মা! যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বিজয়-নগরের সৈন্য; তোমার জন্যই আসি-য়াছে। বিলম্ব করিও না, যাও।" কৃষক স্ত্রী-কন্যা লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল।

লোকাচার্য্য বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শ্রান্ত চরণ অসুস্থ অবশ দেহকে আর বহন করিতে চাহিতেছিল না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি দ্বার-পথে আসিতেই দেখিলেন, দীর্ঘকায় এক যোদ্ধা অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে। শুক্লা নবমীর মলিন চন্দ্রকর তাঁহার ও তাঁহার অনুচর দুইটীর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। মূর্ত্তি ভাল চেনা যায় না; কিন্তু শীঘ্রই সন্দেহ দূর হইল। অশ্বারোহী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি এখানে? সে কৃষক কোথায়?" লোকাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! তাহারা চলিয়া গিয়াছে, অন্বেষণ অনর্থক। সে কন্যাকে—।" দেবরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আপনিই তাহাদের পলায়নের পরামর্শ দিয়াছেন।

আমরা তাহাদের ধরিব। আর আপনাকে বলি, আপনি বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। ইহার শাস্তি বড় সাংঘাতিক। কিন্তু আপনাদের বংশের নিকট আমরা ঋণী। আপনার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, শাস্তি—নির্ব্বাসন। বিজয়নগর-সাম্রাজ্যে আপনার আর স্থান হইবে না।"

দেবরায় সেখানে আর অপেক্ষা করিলেন না। গ্রাম অধিবাসিশূন্য। দূরে তাঁহার অশ্বারোহী মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিতেছে। মুসলমান সৈন্য সংখ্যায় কম ছিল। বিজয়নগরের সৈন্য পথশ্রান্ত হইলেও সেই জন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত অরণ্যের মধ্য দিয়া দেবরায় অশ্ব চালনা করিতেছিলেন। পার্শ্বচর দুইজন দূরে ছিল। তিনি সহসা দেখিলেন, তাঁহার পথরোধ করিয়া পার্শ্ব হইতে একজন অশ্বারোহী শত্রু আসিলেন। তরবারি উত্তোলন করিয়া মুসলমান যোদ্ধা দেবরায়কে আক্রমণ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মুসলমান বীরের শির লক্ষ্য করিয়া দেবরায় অস্ত্র-চালনা করিলেন। সে আঘাত লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেদ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া গেল; তিনি অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন। শত্রুর প্রতি অস্ত্র-নিঃক্ষেপের সময় বেগ-সংবরণ করিতে না পারিয়া দেবরায়ও পতিত হইলেন। তিনি সামান্যরূপ আহত হইয়াছিলেন। অনুচর-দুইজন এমন সময়ে আসিয়া পড়িল। তাহাদের সাহায্যে তিনি পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠিয়া গ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মুসলমান যোদ্ধার শরীর অস্ত্রবিদ্ধ হয় নাই, তবে মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া তিনি চেতনা হারাইয়াছিলেন। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিলেন শিক্ষিত অশ্ব নিকটেই অবস্থান করিতেছে। স্থানটি উন্মুক্ত—বৃক্ষের ভাগ কম। অশ্বের নিকটে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি ভগ্ন গৃহের কয়েক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে; অদূরে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, একটি অট্টালিকা। তিনি অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। শিরস্ত্রাণ ব্যবহারোপযোগী ছিল না, সুতরাং মস্তক অনাবৃত রহিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন সেটি অট্টালিকা নয়, একটা ভগ্ন মন্দির।

মন্দিরে প্রীতা ও তাহার মাতাপিতা আশ্রয় লইয়াছিল। সেই স্থান হইতেই তাহারা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল এবং দেবরায় ও তাহার সঙ্গিগণের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারিল যে, বিজয়-নগরের সৈনিকগণ আহত শত্রুকে ভূপৃষ্ঠশায়ী রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহারা আরও জানিল যে, ভূপতিত যোদ্ধাই তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। যখন তাহারা বুঝিল যে, বিজয়-নগরের সৈন্য-কয়জন অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা ভাবিল, এইবার বাহির হইবে; কিন্তু দেখিল সৈনিক আপনিই আসিলেন ও ভগ্ন সোপানে ভর দিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, সুতরাং তথায় অল্প চন্দ্রালোক ছিল। প্রীতা দূর হইতেই তাহার পরম বাঞ্ছিত কাম্যধনকে চিনিতে পারিয়াছিল। প্রণয়িনীর চক্ষু মিথ্যা বলে না। প্রীতা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। তিনি অনুচরকে

প্রীতাকে কহিল, "মা! এই সৈনিকের হাতে তোকে জন্মের মত দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে চাই। তোর কি ইহাতে আপত্তি আছে? এ সৈনিক ত' আর রাজা নয়— আমাদেরই মত একজন সামান্য লোক।" প্রীতা কোন উত্তর করিল না। তিম্মা মন্দির-দ্বারে আসিল। শব্দ শুনিয়া সৈনিক পিছনে চাহিলেন। অভ্যস্ত হস্ত অসি স্পর্শ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু তিম্মার পরিচিত কণ্ঠস্বরে ও মূর্ত্তি দেখিয়া হস্ত কটিদেশে আসিয়া থামিয়া গেল। তিম্মা বলিল, "সৈনিক! তুমি আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ, আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, জানি না। তোমার হাতে আমার এই মেয়েকে জন্মের মত দিতে ইচ্ছা করি। ইহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই।"

প্রীতা তাহার মাতার সহিত পশ্চাতে ছিল। তাহার মনে হইতেছিল, পৃথিবীর যত আলো সেই তরুণ বদনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকের বৃক্ষশ্রেণীর গাঢ় কালিমার মধ্যে সে মুখখানি সন্ধ্যা-তারার মত জল্ জল্ করিতেছিল। প্রীতা দেখিল, পিতার কথা শুনিয়া যুবক উঠিলেন, বলিলেন, "এ আমার সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আপনার কন্যা আমার স্ত্রী হইতে পারেন না।" তিম্মা বলিল, "কেন যুবক! তুমি একজন সৈনিক, আমি কৃষক, ইহাতে তোমার বংশ-মর্য্যাদার হানি হইবে না। আর তুমি স্বয়ং রাজপুত্র হইলে আমার মেয়ে তোমাকে বিবাহ করিত না। —ওঃ বুঝিয়াছি, তুমি কি বিবাহিত?" যুবক বলিলেন, "আমি বিবাহিত নহি, আমি মহামান্য কুতবর্গ-সুলতানের একজন মুসলমান কর্ম্মচারী।" তিম্মা স্তব্ধ হইয়া থাকিল; পরে কহিল, "উহাকে আমি এখন রক্ষা করিতে পারি না। বিজয়-নগরের দস্যুদল আবার কি বিপদ্ ঘটায় জানি না। আর আমি বুঝিয়াছি, আমার মেয়েরও অমত নাই।" প্রীতা সঙ্কুচিত লতার ন্যায় সরিয়া গেল। যুবক তাহা লক্ষ্য করিলেন ও ক্ষণকালপরে বলিলেন, "বিজয়নগরের বাহিনী আমাদের রাজ্যে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবে না। আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়াছে বটে, কিন্তু রায়চুড় হইতে নূতন সৈন্য আসিলে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন দুষ্কর হইবে, সেই জন্য তাহারা এখনি প্রস্থান করিবে। আপনারা এখন নিরাপদ্। ইচ্ছা করিলে কিছুক্ষণ পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কৃষক যুবকের উদারতা বুঝিতে পারিল না; ভাবিল এ অনিচ্ছা কিন্তু অনিচ্ছার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। মন্দির-মধ্যে যখন সে আপন সংকল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন দেখিয়াছিল কন্যার আপত্তি নাই। তাহার পত্নী এ সব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে না। যুবকের ধর্ম্মের কথা শুনিয়া কৃষক প্রথমে বিচলিত হইয়াছিল কিন্তু প্রীতার ইচ্ছা বুঝিয়া সংকল্প দৃঢ় হইল। যুবকের অনিচ্ছা দেখিয়া সে কহিল, "সৈনিক! যদি আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাও, তাহা হইলে জানিও আমাদের কোন অনিচ্ছা নাই।" যুবক কহিলেন, "আমার ইচ্ছার কথা খোদা জানেন। আপনার কতদূর ইচ্ছা তাহাই দেখিতেছিলাম।" তিম্মা কহিল, "তোমাদের ঈশ্বরের নাম করিয়া শপথ কর যে ইহাকে ধর্ম্মপত্নী করিবে।" যুবক তাহাই করিলেন। তিম্মা তখন কম্পিত লজ্জাবনতমুখী প্রীতার অবশদেহ যুবকের হস্তে

তুলিয়া দিল। যুবক বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে চলুন্।" তিম্মা বলিল, "তুমি কোথা যাইবে?" যুবক উত্তর দিলেন, "আমি কুলবর্গা অভিমুখে যাইব। অল্পদূর অগ্রসর হইলেই আপনাদের জন্ম বাহকের বন্দোবস্ত করিতে পারিব।" কৃষক বলিল, "তোমরা চলিয়া যাও। আমরা এখানে থাকিব। যদি বাহক পাও এখানে পাঠাইয়া দিও।" যুবক প্রীতাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন মন্দির-দ্বারে এই অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইতেছিল, তখন গ্রামের প্রান্তরের উপর দৃশ্য অন্যরূপ। মধুরাও শরীরে আঘাত পাইয়া রণক্ষেত্রে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দেবরায়ের আদেশে কতিপয় সৈনিক তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া প্রীতার জন্ম আনীত পার্শ্বস্থ শিবিকায় তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিল। দেবরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আঘাত গুরুতর নহে। শুশ্রূষার আদেশ দিয়া তিনি তিম্মার কুটীরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। মধুরাও শিবিকা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন দূরে এক ব্যক্তি প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় একটি প্রস্তর-স্তূপের উপর বসিয়া। মূর্ত্তিটি অবশেষে তাঁহারই নিকট আসিতে লাগিল। স্তিমিত চন্দ্রালোকে প্রথমে মধুরাও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, তিনি পুরোহিত লোকাচার্য্য। হস্তের ইঙ্গিতে প্রধান নায়ক পার্শ্বচরগণকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একস্থানে কতিপয় মরণাহত অশ্বের শেষ চিৎকার আহত আরোহীর আর্ত্তনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া রজনীকে বীভৎস করিয়া তুলিতেছিল। নৈশ সমীরণ যন্ত্রণাভারে পীড়িত হইয়া যেন তাহার নিত্য-কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিল।

লোকাচার্য্য প্রথমেই কথা কহিলেন; বলিলেন, "মধুরাও! আমি যাইতেছি। মহারাজাধিরাজের আজ্ঞায় আমার নির্ব্বাসন হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার সন্তানগণের সহিত সুখী হও। যুবরাজ আসিলে বলিও, আমি দেবরায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই। তাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সে যেন সুখী হয়।" মধুরাও ব্রাহ্মণের পদ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "বিজয়-নগরের রাজলক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ভগবন্! আশীর্ব্বাদ করুন্, সাম্রাজ্যের যেন কোন বিপদ্ না ঘটে।" লোকাচার্য্য কহিলেন, "বিরূপাক্ষ-দেবের নিকট প্রার্থনা করি, সাম্রাজ্য-গৌরব যেন অটুট থাকে! কিন্তু মধুরাও, আমি জাগ্রৎ অবস্থায় বিভীষিকা দেখিয়াছি।" লোকা-চার্য্যের নেত্রে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা! ব্রাহ্ম-ণের স্বর শুনিয়া মধুরায়ের বোধ হইতেছিল যেন নির্জ্জন পর্ব্বতের গভীর গুহাকন্দরে বায়ুর আঘাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেন চতুর্দ্দিক্ বিপুল হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে! সে হাহাকার পৃথিবীর নহে—তাহা দানব-শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় অশ্রান্ত বেদনায় ব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত করিতেছে! লোকাচার্য্য দূর প্রস্তর-স্তূপের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "আমি ঐখানে বসিয়াছিলাম। চারিধার হইতে মরণ-চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। মনে হইল, চন্দ্রের দীপ্তি পিঙ্গল হইয়া আসিল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশে তারা নাই! ক্রমে পশ্চিম-গগনে মহাকালের রক্তচক্ষুর ন্যায় চন্দ্র লোহিত

বর্ণ ধারণ করিল। সে তখন নবমীর খণ্ড-চন্দ্র নহে, উজ্জ্বল রক্ত-গোলোক। তাহা হইতে যে আলোক নির্গত হইতেছিল, তাহা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় প্রখর। সে আলোকে সমস্ত প্রান্তর উদ্ভাসিত। দেখিলাম, বিজয়-নগরের সৈন্যব্যূহ কাতারে কাতারে চলিয়াছে। রায়-চূড়ের উপর বিজয়নগরের পতাকা উড়িল, আবার তাহা লুণ্ঠিত হইয়া ভূতলে পড়িল। তারপর দেখিলাম, বিজয়নগরের সম্রাটের শ্রেণী, সৈন্যের শ্রেণী, অশ্বের শ্রেণী, হস্তীর শ্রেণী! জ্যোতিতে নয়ন অন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ বধির করিয়া কত শত বজ্রাগ্নিশিখা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।" এইস্থানে ব্রাহ্মণ নীরব হইলেন।

মধুরাও নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন; নয়ন তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যুক্তহস্তে আপন বদন আবৃত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল কেহই কথা কহিলেন না। পার্শ্ব হইতে একজন হতভাগ্য কাতর ধ্বনি করিল;—তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। দূরে কতকগুলি সেনার হর্ষকোলাহল শুনা গেল।

লোকাচার্য্য আবার বলিতে লাগিলেন, "মধুরাও! তারপর যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর ভুলিব না। বিশাল প্রান্তর—সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে! মনে হইল, পৃথিবীর যত সৈন্য সেই স্থানে একত্র হইয়াছে। বিজয়-নগরের সৈন্য দেখিলাম। তাহাদের বেশভূষা রণসজ্জা দেখিয়া মনে হইল, বিন্ধ্যাগিরি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেও তাহারা উন্মুক্ত অস্ত্রশ্রেণীর সাহায্যে সে পতন রোধ করিতে পারে। মধ্যভাগে বিচিত্র লোহিত চন্দ্রাতপ মণিমুক্তায় ঝলমল করিতেছে; চন্দ্রাতপ-নিম্নে বিজয়-নগরের সম্রাট্, পার্শ্বে রত্নখচিত শিবিকা। মুহূর্ত্তমধ্যে সব পরিবর্ত্তিত হইল। একবার দেখিলাম, এই শিবিকা আর তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; সে-মূর্ত্তি তোমার, দূর হইতে ভাল চিনিতে পারিতেছিলাম না। পরক্ষণেই সব ধূমে ঢাকিয়া গেল—আকাশভেদী গর্জ্জন ও রণকোলাহল শুনিলাম। কি পৈশাচিক চীৎকার! মধুরাও! আমার কর্ণে এখনো তাহা ধ্বনিত হইতেছে!—অন্ধকার চলিয়া গেল; দেখিলাম, সম্রাটের শোণিতাক্ত মস্তক বল্লমের উপর স্থাপিত। আমাদের বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন বিতাড়িত!—এ বিশাল সাম্রাজ্য জীর্ণ গলিত পত্রের ন্যায় প্রলয়-ঝঞ্ঝাবাতে উড়িয়া গেল।"

মধুরাও শিহরিয়া উঠিলেন। ওষ্ঠ হইতে আপনার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিল, "সে শির কাহার? ভগবন্! দেব-রায়কে আশীর্ব্বাদ করুন্।" ব্রাহ্মণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন; বলিলেন, "না মধুরাও! দেবরায় দীর্ঘজীবী হউন্! সে শির দেবরায়ের নহে। সে সম্রাট্ও বীর বটে, তবে অতিবৃদ্ধ। শুক্লকেশ রক্তরঞ্জিত, নয়ন বিস্ফারিত,—শীর্ণ অধরোষ্ঠ অদম্য স্পর্দ্ধাভরে কুঞ্চিত! এখনো সে মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে জাগিতেছে; সে মূর্ত্তি দেব-রায়ের নহে।"

মধুরাওয়ের মনে হইতেছিল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।—এই যুদ্ধক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য, বিজয়নগরের নিহত সম্রাট্, আহতের আর্ত্তনাদ, কপিশ চন্দ্রের মলিন প্রভা—এ সমস্তই যেন স্বপ্নের মত অবাস্তব। তিনি বিমূঢ়ের ন্যায় বলিলেন, "ভগবন্! এ কি স্বপ্ন! বিজয়নগর-সাম্রাজ্য ধ্বংস! ভগবন্, এ স্বপ্ন

হইতে আমায় জাগরিত করুন্।" লোকাচার্য্য কহিলেন, "স্বপ্ন তুমি দেখিতেছ না, মধুরাও! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছিলাম। ভগবান্ বিরূপাক্ষদেব দেব-দেব বিঠলস্বামী করুন্ যেন ইহা স্বপ্নই হয়!

লোকাচার্য্য মুখে এই প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু মানস-চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, রাজধানীর বিরাট অভ্রভেদী মন্দিরগুলি অগ্নি-স্পর্শে জ্বলিয়া উঠিল; নগরীর পর্ব্বতাকার প্রস্তর-প্রাচীর শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না; রাজপথে শোণিতের ধারা বহিল। বিশাল সৌধশ্রেণী আঘাতে আঘাতে কম্পিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ব্রাহ্মণের কর্ণে সেই প্রকাণ্ড নগরের ধ্বংস-যাতনা ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে মৃত্যুরাগিণী গৈরসাপা-জলপ্রপাতের কল্লোলের ন্যায় গম্ভীর।

মধুরাওয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্রাহ্মণ যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলেন। মধুরাও বলিলেন, "ভগবন্! দূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানি না। কেহ ভবিতব্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। এখানে আপনার আগমন ব্যর্থ হইয়াছে। সুলতানের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। ভগবন্! মার্জ্জনা করিবেন, সে বালিকার হস্তরেখা পরীক্ষা কি ঠিক্ হইয়াছিল?"

লোকাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহার যেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে ক্রোধ জন্মাইতে পারে না। তিনি ক্ষুব্ধভাবে কহিলেন, "মধুরাও! মায়াপ্পা আমাকে কখনো অবিশ্বাস করেন নাই। তিনিই এই যুদ্ধকল হইতে আমাকে কিষ্কিন্ধ্যা আহ্বান করিয়া লইয়া যান। নগরীর কোলাহল ভাল লাগিত না বলিয়া এখানে থাকিতাম, কিন্তু মায়াপ্পার আন্তরিক অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া বিজয়-নগরে গেলাম। তুমি মায়াপ্পার বন্ধু হইয়া আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছ?"

মধুরাও কথা কহিলেন না। সহসা দূর হইতে আলোকের আভা মধুরাওয়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ শিবিকার হেম-মণ্ডিত কাষ্ঠদণ্ড হইতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। শিবিকার লোহিত বস্ত্রাবরণ যেন আরও লোহিত দেখাইতে লাগিল। সৈনিকগণ কতকগুলি মশাল সংগ্রহ করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে এবং তৎসাহায্যে আপনাদের হতাহত সঙ্গিগণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে আলোকে লোকাচার্য্য দেখিলেন, প্রধান নায়কের বদন হইতে সন্দেহরেখা দূরীভূত হয় নাই; কহিলেন, "মধুরাও! আমি কিয়ৎক্ষণ-পূর্ব্বে সে বালিকার কর পুনরায় পরীক্ষা করিয়াছি;—বুঝিলাম, পূর্ব্বের গণনা অভ্রান্ত। কিন্তু সে বালিকা কখন রাজরাণী হইবে না, চিরকাল রাজপুত্রবধূই থাকিবে। দেবরায় তাহার অনুসন্ধানে গিয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধান নিষ্ফল। আমি চলিলাম। মায়াপ্পা আসিলে বলিও লোকাচার্য্য বিন্ধ্য-পর্ব্বতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে থাকিবে। শেষ অনুরোধ, আমার বাহকের দল গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের কোন অপরাধ নাই; ফিরিবার সময় তাহাদের লইয়া যাইও। বিরূপাক্ষদেব তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন।"

ব্রাহ্মণ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আকাশে চন্দ্ররশ্মি লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। দূরে

কঠিন ভূমির উপর অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি উত্থিত হইল। মশাল-আলোকে মধুরাও দেখিলেন, দেবরায়ের অঙ্গের স্থানে স্থানে শোণিতরেখা, মস্তক উষ্ণীষ-শূন্য, নিবিড় কেশ বায়ুভরে ইতস্ততঃ উড়িতেছে, মুখে নৈরাশ্যের ভাব। মধুরাও আঘাত-বেদনা তুচ্ছ করিয়া ত্বরিতপদে অগ্রসর হইলেন এবং ধীরে ধীরে সম্রাটের ক্লান্ত দেহ আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন।

গ্রামের অপর অংশে বন-পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি অশ্ব কুলবর্গ অভিমুখে ছুটিয়াছে। অশ্ব-পৃষ্ঠে সেই তরুণ-তপনকান্তি মুসলমান যুবক। এক হস্তে অশ্বরশ্মি ধৃত, অন্য হস্ত প্রীতার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যুবক ভাবিতেছিলেন, যুদ্ধে জয় তাঁহার, কারণ রত্ন তাঁহার হস্ত-বেষ্টনীর মধ্যে। সে বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া প্রীতার দেহলতা বারংবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল।

(ক্রমশঃ)

আমাদের খাদ্য।

আমিষ আহার।

মৎস্য।—আমিষ আহারের মধ্যে মৎস্যই আমাদের দেশে প্রধান। মৎস্যে প্রোটিনের (Protein) এর ভাগ মাংসের সমান, যদিও বিভিন্ন-জাতীয় মৎস্যে ইহার পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অল্প পরিমাণ তৈলীয়-ভাগ-বিশিষ্ট মৎস্য সহজে পরিপাক হয়, কিন্তু ইহার পুষ্টিকর গুণ অল্প। তৈলযুক্ত মৎস্য গুরুপাক কিন্তু অধিক পুষ্টিকর, যদিও সময় সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।—খুব শক্ত-মাংসযুক্ত মৎস্যের শীঘ্র পরিপাক হয় না।

লবণে রক্ষিত কিংবা শুষ্ক (শুঁট্‌কী) মৎস্যে জলের পরিমাণ অল্প; সেজন্য ইহাতে টাট্‌কা মৎস্যের উপাদান অপেক্ষা সকল উপাদানের পরিমাণ অধিক। কিন্তু উপকারিতায় টাট্‌কা মৎস্য অপেক্ষা অধিক কি-না তাহা সন্দেহ।

মাছের মুড়াতে মস্তিষ্কের উপকারী পদার্থ আছে কি-না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূল্য-হিসাবে সস্তার তৈলযুক্ত মৎস্যই আয়প্রদ, কিন্তু বাজারের দাম-হিসাবে খাদ্য দ্রব্যের উপকারিতা নির্ণয় করা সকল সময় সম্ভবপর নয়।

কাঁকড়া, চিংড়ি, সামুক, ঝিনুক প্রভৃতিকে মৎস্যের মধ্যেই গণ্য করা হয়। ইহাদের মাংস অপেক্ষা পেশীই প্রধান। কিন্তু মৎস্য অপেক্ষা ইহারা গুরুপাক-খাদ্য। সামুকও গুগ্‌লী-জাতীয় খাদ্য কাঁচা খাইলে সহজে পরিপাক হয়। মাংস অপেক্ষা ইহাদের পুষ্টিকর গুণ কম, এবং কোন কোনটার পুষ্টিকর গুণ দুগ্ধের সমান।

মাংস।—গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, খরগোস ও পক্ষীর মাংসই সাধারণতঃ মানবের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। গোমাংস আমাদের দেশীয় আহার নহে। ইহা অন্যান্য মাংস অপেক্ষা গুরুপাক এবং সকল মাংস অপেক্ষা ইহাতে প্রোটিনের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভেড়ার মাংসও যদিও আমাদের দেশে অধিক ব্যবহৃত হয় না, তথাপি ইহা স্বাদু ও সহজে পরিপাক হয়। ভেড়ার মাংসে চর্ব্বির ভাগ অন্যান্য মাংস অপেক্ষা অধিক। যদিও ভেড়ার মাংসে প্রোটীনের ভাগ বেশী, কিন্তু চর্ব্বি কম ও জলীয় ভাগ অধিক।

ছাগ-মাংসই আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত এবং ইহাতে চর্ব্বির পরিমাণ অধিক নহে।

মাংসের চারিভাগের তিন ভাগ জলীয় পদার্থ এবং ইহার কমবেশী চর্ব্বির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ছোট জানোয়ারের মাংসে জলের পরিমাণ অধিক এবং ইহার পুষ্টিকর গুণ অল্প। প্রোটীনও সেই হিসাবে বিভিন্ন। যদিও মাংসে খনিজ পদার্থ (mineral substance) খুবই কম, কিন্তু ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। মাংসের রসের লালবর্ণের মধ্যে লৌহ বর্ত্তমান, এবং মাংসের রসে(meat juice) ফস্ফরিক এসিড ও পটাস থাকে। মাংসের নির্য্যাস জলে সিদ্ধ করিয়া বাহির করা যায়। পূর্ণবয়স্ক জন্তুর মাংস হইতেই পুষ্টিকর নির্য্যাস পাওয়া যায়। নির্য্যাসের গুণাগুণ জন্তুর আহারের উপর নির্ভর করে। বন্যপক্ষী কিংবা খরগোসের মাংসের স্বাদেও গৃহপালিত পক্ষী কিংবা খরগোসের মাংসের স্বাদে অনেক প্রভেদ।

মাংস কাটিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে অনেক সময় স্বাদের উন্নতি হয়। ইহার কারণ, ঐরূপ ঝুলাইয়া রাখার সময় এসিডের কার্য্য দ্বারা ইহার স্বাদ পরিবর্দ্ধিত হয়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে, পচনক্রিয়ার দ্বারা মাংসের স্বাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে।

রন্ধনকালে সিদ্ধ করিবার গুণে মাংসের পেশীস্থ সূত্রগুলি শিথিল হয় ও চর্ব্বি ও জলীয় ভাগ অনেক কমিয়া যায়।

মাংসের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান প্রোটীন, কিন্তু বিভিন্নপ্রকার মাংসের পুষ্টিকর গুণ সচরাচর চর্ব্বির কম-বেশী অনুসারেই নির্দ্ধারিত হয়। যদিও মাংস একটী সম্পূর্ণ আহার নহে, কিন্তু ইহা সহজেই পরিপাক হয় এবং ইহাতে শক্তি-বৃদ্ধিকারী ও পেশী-গঠনকারী মূল্যবান্ উপাদানসমূহ বর্ত্তমান। মাংস অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য আহার, বিশেষতঃ, যখন ছোট ছোট জন্তুর মাংস ব্যবহার করা হয়।

ডিম্ব।—ডিম্বের পুষ্টিকর উপাদান মাংসেরই সমান, কিন্তু ইহাতে তৈলীয় পদার্থ (fat) অধিক এবং প্রোটীন কম। ডিম্বে শর্করা-জাতীয় উপাদান একেবারে না থাকায় ইহা রুটী, ময়দা, পায়স প্রভৃতি সকলপ্রকার খাদ্যের সহিতই মিশ্রিত করা যাইতে পারে। একটী ডিম্বের শক্তিসঞ্চারক ক্ষমতা তিন পোয়া মাংস কিংবা আধ সের খাঁটী দুগ্ধের সমান।

সকল-জাতীয় ডিম্বের রাসায়নিক উপাদান একই, কেবল ভিন্ন-জাতীয় পক্ষীর ভিন্ন প্রকার আহারের জন্য ডিম্বের গন্ধ বিভিন্ন। ডিম্বের খোসা কেবলমাত্র (carbonate of lime) কার্বনেট অব লাইম-নির্ম্মিত। ডিম্বের খোসার বর্ণের সহিত ডিম্বের পুষ্টি-কারিতার কোন সম্বন্ধ নাই। ডিম্বের শ্বেত পদার্থ প্রধানতঃ প্রোটীন। ডিম্বের হরিদ্রা ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর; কিন্তু ইহা কি উপাদানে গঠিত, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। ইহাতে কিছু ফসফরসযুক্ত প্রোটীন ও ইহা ব্যতীত লৌহ উপাদান বর্ত্তমান

থাকে। ডিম্ব-হরিদ্রার শতকরা ৩০ ভাগ তৈলীয় পদার্থ। মাখনের তৈলীয় পদার্থের ন্যায় ইহা অত্যন্ত বিশিষ্টভাবে হরিদ্রাংশে মিশ্রিত থাকে। হরিদ্রাংশের উপকারিতার ইহাই প্রধান কারণ। উপরি উক্ত প্রোটীন লৌহ ও চুণ মিশ্রিত হইয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। খুব সম্ভব চুণও অন্য দুই উপাদানের ন্যায় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত থাকে। দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে এ পরিমাণ চুণ নাই। ডিম্বের হরিদ্রাবর্ণ যত গাঢ় হইবে, ইহাতে লৌহের পরিমাণ ততই অধিক বুঝিতে হইবে। একটী ডিম্বের লৌহ-ভাগের পরিমাণ ১৮ আউন্স (আধসেয়) দুগ্ধের সমতুল্য।

চুণের জলে ডুবাইয়া রাখিলে ডিম্ব অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

(ক্রমশঃ)

ডিম।

মানব-শরীরের পুষ্টি-সাধনের জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সকল দ্রব্য ডিমের ভিতর আছে বলিয়া ডিম মানবের একটি খাদ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে হাঁস ও মুর্গী এই দুইটী পাখীর ডিমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সম্বন্ধেই এইস্থলে কিছু বলিতেছি।

ডিমের উপরকার খোলাটা সমস্ত ডিমটির প্রায় দশমাংশ। ইহার মধ্যে পুষ্টিকর কিছু নাই বলিয়া, ইহাকে ত্যাগ করা হয়। খাদ্যের পুষ্টি-কারিতা সেই দ্রব্যের নাইট্রোজিনাস্ বা যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে।

খোলাটির নিম্নে শ্বেতবর্ণ পদার্থ। ইহার শতকরা ৮৫ ভাগ জল। অবশিষ্ট ১৫ ভাগ কঠিন পদার্থ; তন্মধ্যে ১২ভাগ প্রোটিন * (egg albumin), অর্দ্ধভাগ চিনি, সামান্য Fat (স্নেহজাতীয় দ্রব্য) এবং অন্যান্য দ্রব্যও সামান্য সামান্য আছে। উত্তাপের সহিত এই অংশ কঠিন হইতে থাকে।

শ্বেতাংশের ভিতরের পদার্থকে Yolk (বা কুসুম) কহে। ইহার দুইটী অংশ—একটী হরিদ্রা-বর্ণের, অপরটি বর্ণহীন, অর্থাৎ জলের ন্যায়। ইহা খাদ্য-ভাণ্ডার। ইহাতে অল্প-পরিমাণে, fat (স্নেহজাতীয় পদার্থ), লৌহ এবং ফস্‌ফরাসের যৌগিক পদার্থ আছে। এতদ্ব্যতীত ভাইটেলিন্ নামে ফস্‌ফোপ্রোটিন্-পদার্থও আছে। ইহাই ডিম্বমধ্যস্থ প্রাণীটির পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার ভিতরে অল্প-পরিমাণে এলবুমেন এবং তৈলময় পদার্থ আছে। উত্তাপ পাইলেই আলবুমিন কঠিন হইয়া যায়; সেইজন্য ভিতরকার পীতাংশ শীঘ্র কঠিন হয় না।

মুর্গীর ডিমের ভিতরের দ্রব্যগুলি ও হাঁসের ডিমের ভিতরের দ্রব্যগুলি সমস্তই ঠিক এক নহে। আর যে সমস্ত জিনিষ আছে, তাহাদের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খাদ্যের পুষ্টিকারিতা নাইট্রোজেন বা যবক্ষারযুক্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে। সেই-হিসাবে মুর্গীর ডিম বেশী পুষ্টিকর। কারণ, মুর্গীর ডিমে শ্বেতাংশ শ্বেত-পদার্থের অর্দ্ধেক

---

* প্রোটিনের উপাদান—কার্ব্বন্, উদজান, যবক্ষারজান, গন্ধক ও অম্লজান।

এবং হাঁসের ডিমে ইহা অনেক কম। সেই পীতাংশে প্রোটিন বেশী এবং অন্যান্য যবক্ষারজানযুক্ত বা ছানা-জাতীয় পদার্থও আছে; কিন্তু শ্বেত অংশের মধ্যে সেরূপ নাই।

ডিমের পুষ্টিকারি-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। একটী মুর্গীর ডিম প্রায় অর্দ্ধসের দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টি-সাধন করে। একটি ডিমের শতকরা ৫ ভাগ নষ্ট হয়, বাঁকি সমস্তই দেহের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার ভিতর লৌহ থাকায়, যখন আমাদের শরীরে ইহা গৃহীত হয়, তখন লৌহ রক্তে মিশিয়া রক্ত-কণিকার সংখ্যা বর্দ্ধিত করে এবং রক্তের পরিমাণেরও বৃদ্ধি করে। ইহার মধ্যে ক্যালসিয়াম-ধাতু যে অবস্থায় আছে, তাহার সমস্তই দৈহিক উপাদানে মিশ্রিত হয়। দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে এরূপ পদার্থ নাই। সেইজন্য অস্থি ভগ্ন হইলে চিকিৎসকগণ প্রায়ই ডিম খাইতে বলেন। কারণ, হাড়ের পরিপুষ্টি ক্যাল্‌সিয়ম্‌-দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

ডিম্বের পরিপাক রন্ধনের উপর নির্ভর করে। অসিদ্ধ ডিম্ব অপেক্ষা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব অল্প সময়ে পরিপাক হয়। ডিম অসিদ্ধ অবস্থায় খাইলে উহাকে চিবাইতে পারা যায় না এবং লালাও ভালরূপ নিঃসৃত হইতে পারে না। এজন্য উহার পরিপাক শীঘ্র হয় না। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব পূর্ণসিদ্ধ ডিম্ব অপেক্ষা অল্প সময়ে পরিপাক হয়; কারণ, পূর্ণ সিদ্ধ ডিম্বে প্রোটিন পদার্থ অত্যন্ত কঠিন হয় এবং উত্তমরূপে না চিবাইলে উহার সহজে পরিপাক হয় না।

আমাদের দেশে যাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদের পক্ষে শীতকালে ডিম খাওয়াই প্রশস্ত। কারণ, এই সময়ে শরীর অত্যন্ত কার্য্যক্ষম হয়। ডিম খুব বেশী খাওয়া উচিত নহে এবং খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়াও উচিত নহে। কারণ, ডিমের শ্বেতাংশ সমস্তটী পরিপাক হইয়া নির্গত হইতে না পারিলে, মূত্রে (Albumin) হয়। জলবায়ু এবং শরীরের ধাত বুঝিয়া ডিম খাওয়া উচিত।

ডিম অনেক দিন গৃহে রাখিতে হইলে চূণের জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। ১ পাইণ্ট জলে ১ ছটাক লবণমিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে ডিম ডুবাইয়া রাখিলে খারাপ ডিমগুলি ভাসিয়া উঠিবে। নষ্ট ডিম অত্যন্ত অপকারী, ইহা বিষাক্ত।

একটী ডিম না খাইয়া অনেক দিন ঘরে তুলিয়া রাখিলে, উহা ভিতরে ভিতরে খারাপ হইতে থাকে এবং পরে অত্যন্ত জোরে শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। তখন অত্যন্ত বিষাক্ত দুর্গন্ধও বাহির হইতে থাকে।

ডিম সিদ্ধ করিতে হইলে জল খুব ফুটাইয়া তাহাতে ডিম দিয়া নামাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে ডিম অর্দ্ধসিদ্ধ হয়। যদি ডিমের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া ফুটান হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহার জলমগ্ন অংশ উত্তাপ পাইয়াছে এবং কঠিন হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বের মতই আছে।

আমাদের একটা সংস্কার যে হাঁসের ডিম খাইলে বাত হয়, কিন্তু ইহাতে বাতের পক্ষে অনিষ্টকারী কিছু নাই। সুতরাং ইহা খাইলে কোন অনিষ্ট না হইতে পারে। তবে জলবায়ু ও শরীর দেখা উচিত। সমস্ত ডিমটার পরিপাক হওয়ার দরকার, নতুবা অনিষ্ট হইতে পারে। অল্প-পরিমাণে ডিম-ভক্ষণ আমাদের উপকারী, অপকারী নহে।

শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য।

প্রেমের শক্তি।

(পারস্য ইতিহাসের গল্পাবলম্বনে রচিত)

রাজার গুণের তুলনা ছিল না; দেশের লোকেরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু রাজা বড় অসুখী; কারণ, তাঁহার পুত্র একটি জড়-পিণ্ড। রাজপুত্রকে দেখিয়া কাহারও মনে হইত না যে তাঁহার কোন বোধশক্তি আছে। রাজ্যের যত বীর তাঁহাকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে আসিতেন; রাজপুত্র বিহ্বলনেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতেন। দেশের যত পণ্ডিত রাজপুত্রকে লেখা-পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মূর্খত্ব ঘুচিল না। এই জড়ভরতের মত পুত্র লইয়া রাজা কি করিবেন? কতজন কত দেশের গল্প করিত, কিন্তু রাজপুত্র প্রাসাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া একদিনও বাহিরে আসিতেন না। প্রাসাদের বাহিরের শ্যামলা উজ্জ্বলা ধরণীর সহিত রাজপুত্রের একদিনও পরিচয় ঘটিল না। নদীর নৃত্য, গিরির মহিমা, কাননের গাম্ভীর্য্য সবই অনাঘ্রাত পুষ্পের মত দূরে পড়িয়া থাকিত।

বিজয়-মাল্য লইয়া যখন রাজার বাহিনী ফিরিয়া আসিত, রাজপুত্র সে বাহিনীর নেতা বা দর্শক কিছুই থাকিতেন না। রাজা শিকার করিয়া আসিতেন, রাজপুত্র স্তব্ধ হইয়া পিতার কীর্ত্তি দেখিতেন। রাজপ্রাসাদের উচ্চকক্ষের এক কোণে বসিয়া তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, যেন তিনি সেই পাষাণ-গৃহের একখণ্ড মর্ম্মর-প্রস্তর। তাহার পর গভীর রজনীতে সারা জগৎ নিঝুম হইয়া আসিলে যেমন দীর্ঘ তরু তাহার নিশ্চল পত্র-শাখা সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তিনি সেইরূপ অবশ আলস্যে মর্ম্মর-হর্ম্ম্যের সুখ-শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া দিতেন।

এমন নিশ্চিহ্ন অসাড় প্রাণে সহসা ভাবের লীলা দেখা দিল। আঁধার গগনে একটি ক্ষীণ রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। রাজবাড়ীর নিকটে এক দরিদ্র বাস করিত। তাহার কুটির-আলো-করা এক মেয়ে ছিল। রাজপুত্র জানালা হইতে সেই মেয়েটিকে দেখিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন। সব দেশেই গরীব লোক আছে; গরীবের মেয়ের রূপ দেশের রাজপুত্র ও রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারও বিরল নহে। কিন্তু এ রকম রাজপুত্র, যাঁহার মত মূর্খ রাজ্যে ছিল না, যিনি আহার-নিদ্রা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে বলিয়া জানিতেন না, তিনিও শেষে রূপের উপাসক হইলেন!

বসন্ত আসিলে পৃথিবীর সমস্ত অঙ্গ জুড়িয়া একটি সাড়া পড়িয়া যায়। শীতের সময় যে বাতাস স্তব্ধ হইয়া থাকে সেও তখন চঞ্চল হইয়া উঠে। আজ রাজপুত্রের জীবনে বসন্ত আসিয়াছে। তাঁহার জীবনের আজ সুপ্রভাত। প্রেমের আলোকে তাঁহার তরুণ হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র কুটিরের দুয়ারে ঊষার মত নিরাভরণা বালিকাটি দাঁড়াইয়া। তিনি রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন আসিলেন, তখন সে কুটীরের ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। কতবার তিনি কুটীরের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, যাহার জন্য এ ব্যাকুলতা তাহার দেখা তখন আর মিলিল না।

শিক্ষক প্রতিদিন সকালে যেমন প্রাসাদে

পড়াইতে আসেন আজও তেমনি আসিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্র ঘরে নাই। জানালার ধারে গিয়া দেখিলেন, দূরে সবুজ গাছের তলায় নদীর ধারে রাজপুত্র একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তাহারা উভয়ে কুটিরের নিকটে আসিলে তিনি মেয়েটীকে চিনিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্রের মুখে একটি নূতন ভাব আসন পাতিয়াছে আর তাঁহার চোখে একটি নূতন আলোক খেলা করিতেছে।

ঘুমন্ত শিশুর অধরে যেমন একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা লাগিয়া থাকে, রাজপুত্র সেইরূপ একটা সুখের ভগ্নস্মৃতি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পড়া সে-দিনও হইল না। শিক্ষক দেখিয়া গেলেন, আজ সে জড়পিণ্ড নিশ্চল নহে বটে, কিন্তু বড় অন্যমনস্ক।

পরদিন সূর্য্যের আলোকে চারি দিক্ ঝল্‌মল্ করিতেছিল। শিক্ষক প্রাসাদে আসিবার সময় দেখিলেন, বাহিরে বাগানের পাশে রাজপুত্র মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্রের কথায় মেয়েটির মুখে এক রাশ রক্তের উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়িল। সে রঞ্জিত মুখমণ্ডলের কারণ রাজপুত্রের ভাষা, প্রভাত-সূর্য্যের রক্ত আভা নহে।

তিনি রাজপুত্রের কক্ষের অভিমুখে না যাইয়া রাজার নিকটে গেলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিতের শীর্ণমুখে বেদনা ও ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আজ বড় ক্ষোভে আপনার নিকটে একটি কথা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এত দিন রাজপুত্রকে শুধু মূর্খ বলিয়াই জানিতাম, আজ জানিলাম, তিনি দুশ্চরিত্র। প্রাসাদের নিকট যে দরিদ্র ব্যক্তি বাস করে, তাহার ফুলের মত সুন্দর একটি কন্যা আছে। রাজপুত্র সেই বালিকাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

এতদিন রাজার প্রশস্তললাটে সকল সময়েই চিন্তার কালিমা মাখান থাকিত। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সে আঁধার দূর হইল। তিনি উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন! আজ মাটির পিণ্ডে স্পন্দন আসিয়াছে।"

শিক্ষক প্রতিকারের আশায় আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এমন সময় সেই জীর্ণ কুটিরের দীন অধিবাসী অভিবাদন করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে বলিল, "মহারাজ! বিচার চাহি।" রাজা বলিলেন, "তোমার অভিযোগের কথা বল।" রাজার ন্যায়-বিচারের কথা সকল প্রজাই জানিত। সে সঙ্কোচ না করিয়া বলিল, "যুবরাজ আমার কন্যার প্রণয়-প্রার্থী! ফল কি হইবে জানি না। ইহাতে আমাদের সম্মান চিরকালের জন্য নষ্ট হইতে পারে।" রাজা বলিলেন, "সে কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। প্রজার সম্মান রাজার বিলাসের সামগ্রী নহে। তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার আমার। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। তোমরা কি আমার পুত্রকে চেন? সে ত' কখন প্রাসাদের বাহিরে পূর্ব্বে যায় নাই, আর তাহার বেশভূষাও যুবরাজের মত নহে।" কুটিরবাসী বলিল, "আমি কয়েকবার প্রাসাদে পুষ্পমালা দিতে আসিয়াছিলাম। মহারাজের শিকার বহিয়াও অনেকবার আসিয়াছি। আমি যুবরাজকে প্রাসাদে দুইবার দেখিয়াছি। আমার কন্যা কখনও দেখে নাই, সে এখনও

জানে না যে তিনি যুবরাজ।” রাজা বলিলেন, “এখন আমার কথা শোন। তোমার কন্যার দ্বারা দেশের মহা উপকার সাধিত হইতে পারে। আমার পুত্র তাহাকে ভালবাসে: সুতরাং সে যাহাই বলিবে, আমার পুত্র তাহাই করিবে। তোমার কন্যাকে বলিও সে যেন যুবরাজের মনে সকল বিষয়ে দক্ষতা-লাভ করিবার বাসনা জাগাইয়া তোলে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার পুত্র সব করিবে। সে মূর্খ, বিদ্বান্ হইবে; সে অলস বীর হইবে, তাহার সেই রক্ত-মাংসের পাষাণ দেহে প্রাণ-সঞ্চার হইবে। বড় গুরুভার তোমার মেয়ের উপর রহিয়াছে। যদি এ-কাজ সিদ্ধ হয়, দেশের অশেষ মঙ্গল। নচেৎ আমার মৃত্যুর পর রাজ্যে অত্যাচার ও রক্তপাতের স্রোত বহিবে। বল, তোমার কন্যা কি এ ভার বহিতে পারিবে?”

কৃষক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। রাজা ভাবিতেছিলেন নিজ-পুত্রের ভবিষ্যৎ; শিক্ষক ভাবিতেছিলেন রাজার সহৃদয়তা ও মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতার কথা। কন্যার পিতা বলিল, “বুঝিয়াছি, মহারাজ। আমার মেয়ের যাহা সাধ্য করিবে।” রাজা বলিলেন, “তোমার কন্যা যেন তাহাকে শুদ্ধ আশা দেয় যে যুবরাজ তাহার প্রেমের উপযুক্ত হইলেই তাহাকে লাভ করিতে পারিবে। সে যদি কেবল এইটুকু করিতে পারে, প্রেম অবশিষ্ট সমস্তই করিবে। এ কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিবার যদি ক্ষমতা থাকে, সে আপনার সম্মান আপনিই রাখিতে পারিবে।”

পিতার নিকট হইতে কন্যা সব শুনিল। সেও যুবরাজকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু তখন জানিত না যে তিনি যুবরাজ। যুবরাজের কথা সকলেই জানিত, সেও জানিত। কিন্তু আজ যুবরাজ তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী জানিয়াও তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার উপর কি গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত হইতেছে। সে দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিল। দেশের সুখ-দুঃখ, শান্তি-রক্তপাত, বিচার-অত্যাচারের জন্য সেই এখন দায়ী। সে মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন সে রাজপুত্রের জীবনে পূর্ণতা—সফলতা আনিয়া দিতে পারে।

রাজপুত্র তন্ময় হইয়া বালিকাকে দেখিতে-ছিলেন। কুটিরের মাটির দেওয়ালে কুটির-স্বামীর অস্ত্র ঝুলিতেছিল। বালিকা কহিল, “কুমার! তুমি কি এ অস্ত্রের ব্যবহার জান?” রাজপুত্র বলিলেন, “না, আমি কোন অস্ত্রেরই ব্যবহার জানি না।” পর দিন প্রভাতে যখন রাজপুত্র বলিলেন, “এস, বনের ধারে পাহাড়ের তলায় বেড়াইয়া আসি।” তখন বালিকা বলিল, “না, বাবা বলিয়াছেন, ‘ওখানে যত হিংস্র পশুর বাস।’ গেলে তোমার বিপদ্ ঘটিতে পারে।” রাজপুত্র বলিলেন, “ঠিক কথা। তারা তোমার অনিষ্ট করিতে পারে।” তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া সেনাপতিকে বলিলেন, “আমাকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিন্।”

রাজা যে-দিন সেনাপতির নিকটে শুনিলেন, তাঁহার পুত্র ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহারই সমান হইয়াছে সে-দিন, বুঝিলেন রাজপুত্রের শিক্ষার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

রাজপুত্র এইবার একদিন বালিকাকে বলিতেছিলেন, “চল, আজ যাই, আজ কোন ভয় নাই।’ তখন রাজপুত্রের কটিতে হীরক-

খচিত তরবারির প্রান্ত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, এবং হস্তে ধনুর্ব্বাণ বীরত্বের পরিচয় দিতেছিল। সে-দিন কাননের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া রাজপুত্রের মুখ হইতে যে ভাষার স্রোত বহিল, তাহা আপন বীরত্বে আপন ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেই বাহির হইতে পারে।

একদিন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য যখন পৃথিবীর সর্ব্ব অঙ্গে তাঁহার দীপ্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন বালিকা বলিল, "কুমার! আমাকে লেখা-পড়া শিখাইতে পার? আমার বড় ইচ্ছা আমি লিখিতে পড়িতে শিখি।" রাজপুত্র বলিলেন, "আমি ত' ও সব জানি না।" বালিকা বলিল, "তবে আর আমার শেখা হইল না।" বালিকার নৈরাশ্যে রাজপুত্র মনে ব্যথা পাইলেন; বলিলেন, "আচ্ছা! কিছুদিন পরে আমিই তোমাকে শিখাইব।"

সে-দিন পণ্ডিত-মহাশয় আপনার গৃহে আহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় রাজপুত্র আসিয়া বলিলেন, "আমাকে পড়ান্। আমি পড়িতে চাহি।" শিক্ষার জন্য তখন তাঁহার কি উৎসাহ, কি অধ্যবসায়! প্রেমের দ্বারা এইরূপে রাজপুত্রের জীবনকুসুমের আর একটি দল খুলিয়া গেল। রাজা, শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কুটির-বাসিনী কন্যা কি যাদু জানে?

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। কুটিরের ছিদ্র দিয়া তপনের শেষ কিরণ দীর্ঘ অঙ্গুলীর আকারে আসিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় বালিকার মস্তকে পড়িয়াছে। তাহার পার্শ্বে বসিয়া রাজপুত্র পাঠ বলিয়া দিতেছেন। পুস্তকের দিকে তাহার আজ দৃষ্টি ছিল না। সে কেবল কুমারের উৎসাহ-ভরা মুখের পানে চাহিয়া ছিল। যুবরাজের কথা সে শুনিতেছিল না;—সে শুনিতেছিল শুধু তাহার ঝঙ্কার, আর ভাবিতেছিল কতদিন আর পরীক্ষা চলিবে। রাজপুত্র বলিলেন, "আজ তোমার পড়ায় মন নাই, চল, বেড়াইতে যাই।" পাঠ সাঙ্গ না করিয়া দুইজনে নদীর ধারে আসিলেন।

তখন দিগন্তের কোলে ঘনকৃষ্ণ-বন-রেখার অন্তরালে অস্তগামী তপন ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল। সেই তরল-কনক-কিরণজালের যবনিকার পরপ্রান্তে কত অজানা দেশ লুকাইয়া আছে! সঙ্গিনী বলিল, "কুমার! ওখানে কি দেশ আছে তুমি ত কত বই পড়িয়াছ, ঐ দেশের গল্প বল।" রাজপুত্র বলিলেন, "ও-সব দেশের কথা পড়ি নি। তবে তুমি যদি বল, আমি ও-গুলি দেখিয়া আসিতে পারি।" তাঁহার কণ্ঠে ও চোখের ভাষায় একটি অস্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। বালিকা বলিল, "তাই যেও। ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকট গল্প করিও!" যুবরাজ বলিলেন, "তোমার পড়া ত' তাহা হইলে হ'বে না!" বালিকা বলিল, "তুমি এলে হ'বে।" রাজকুমার ক্ষণকাল নীরব থাকিলেন। বালিকা ভয় করিতেছিল, বাঁধন শক্ত হইলে পাছে ছিঁড়িয়া যায়! কিন্তু ফুলের মালার বাঁধন যতই শক্ত হয়, স্পর্শ ততই কোমল হয়। যুবরাজ এইবার প্রাণের কথা বলিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "কত দিন তোমাকে দেখিতে পাইব না!" বালিকা বুঝিল এবারও প্রেমের জয় হইয়াছে। সে হর্ষ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "আমি প্রতিদিন ঠিক এমনই সময় এখানে দাঁড়াইয়া তোমারই কথা ভাবিব। ভাবিব,

আমার সম্মুখ হইতে যে সূর্য্য বিদায় লইতেছে, সে তোমারই নিকট যাইবে।" রাজপুত্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "যখন এই বাতাসের ঢেউ গিয়া আমার দেহে লাগিবে, আমি ভাবিব, তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান লুপ্ত হইয়াছে।"

তিনটি বৎসর পরে নূতন জীবনের তিনটি অধ্যায় শেষ করিয়া রাজকুমার প্রাসাদে ফিরিলেন। তিনি কুটিরে আসিয়া দেখিলেন যে, বালিকার রূপ যেন আরও বাড়িয়াছে। কেবল শ্যামল তট-ঘেরা সরোবরের কালো জলের মত কালিমাভরা চক্ষু-দু'টি ছল ছল করিতেছে। রাজপুত্রের আনীত উপহারের রাশি পড়িয়া রহিল। সে কেবল গল্প শুনিয়া দীর্ঘ দিন গুলি কাটাইতে লাগিল।

তারপর একটি শান্ত জ্যোৎস্না-রাতে প্রলয়-রোলের ন্যায় রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেশের বাহিরে শত্রু আসিয়াছে। রাজার সৈন্য যুদ্ধে যাইবে। তরুণীর মুখ তখন চন্দ্রমার রশ্মির ন্যায় কপিশ। সে ভগ্ন-কণ্ঠে কহিল, "কুমার! এ যুদ্ধে সেনাপতি কে?" তাহার ওষ্ঠ বলিতে চাহে, 'এ যুদ্ধে কি অন্যের সেনাপতি হওয়া সাজে? তোমার দেশ, তোমার রাজ্য, তোমার সৈন্য প্রাণ দিতে যাইতেছে, তুমি পথ দেখাইয়া না দিলে আজ বড় অপমান, বড় লজ্জা! তুমি যাও।" কিন্তু নয়ন তখন বলিতেছিল, 'কোথায় যাইবে? যাইও না, আমি একেলা থাকিব কেমন করিয়া?' রাজপুত্র উত্তরে বলিলেন, "এ যুদ্ধে আমিই সেনাপতি হইব, পিতার অনুমতি লইয়া আজই যাত্রা করিব। যদি না আসি—" ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া তরুণী কহিল, "তাহা হইলে ঐখানে আবার দেখা হইবে!"

জীবনের চারি অংশ পূর্ণ করিয়া চারি মাস পরে বিজয়ী কুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন। উন্মত্ত ঝঞ্ঝার মত যখন তিনি শত্রুসৈন্য মথিত করিতেছিলেন, তখন চঞ্চলা চপলার ন্যায় প্রণয়িনীর হাস্য তাঁহার মানসপটে ভাসিতেছিল। যখন অশ্বক্ষুরাহত ধরণী-বক্ষ হইতে উত্থিত ধূলি-জালে শত্রুব্যূহ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন জলপ্রপাতের শ্বেত বাষ্পরাশির উপর রচিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় তরুণীর বিশাল নয়নের জ্যোতিঃ সে ধূলির আঁধার আলোকিত করিতেছিল। অস্ত্রের ঝনঝনা ও বর্ম্মের সঙ্ঘর্ষণের মধ্যে তিনি তাহারই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলেন। আজ যুদ্ধের অবসানে তিনি তাঁহার মানস-প্রতিমাকে নয়ন-সম্মুখে বিরাজিত দেখিলেন। সে প্রতিমা দুইজনের পিতার মধ্যস্থানে স্থাপিত—আজ তাহার বধূ-বেশ!

উপদেশের ঝুড়ি।

সকালে উঠে ঘর ঝাঁট্ দেওয়া আমাদের সংসারে একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। সচরাচর আমরা প্রথমে ঝাঁট দিয়া পরে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিই। কবি রবীন্দ্রনাথের 'জুতার জন্ম' বলে কবিতায় রাজার পায়ে ধূলো যা'তে না লাগে, সেই জন্য রাজ্যের যত ঝাড়ুদার মিলে ধূলো তাড়াতে আরম্ভ করল। তারা এমন জোরে ঝাড়ু চালাতে লাগল যে

দেশ ধূলোয় ভরে গেল, পায়ের ধূলো মাথায় গিয়ে উঠ্‌ল, আর দেশের লোকের দম বন্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল। আমাদের ঘরে ঝাট্‌ দেওয়াও ঠিক্ ঐ রকম ব্যাপার। সে সময় ঘরে যে থাকে, তা'র নাকে, মুখে, চোখে ধুলো যায়, আর ঘরের যত ধুলো উপরে উঠে আস-বাব্‌-পত্রের উপর জমে। ধুলো এত উপকারী জিনিশ নয় যে, নাকে মুখে চোখে বিছানা ও আল্‌মারীর ওপর তাকে স্থান দিতে হ'বে। যদি উপকারী হ'ত, তা হ'লে আর ঝাঁটা দিয়ে তা'কে দূর করে দেওয়ার দরকার হ'ত না। ধুলো অপরিষ্কার ত' বটেই, তা ছাড়া রোগ ছড়িয়ে দিতেও সময়ে সময়ে সাহায্য করে। ঝাঁট দেওয়ার পর যে জল ছিটান হয়, তাতে কতকটা ওড়া ধুলো জলের সঙ্গে নীচে পড়ে। ফলে ঘরের ধুলো ঘরেই থেকে যায়। ঝাঁট দেবার আগে কুচি কুচি করে কাগজ মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে তারপর ঝাঁট দিলে বেশী ধুলো উড়্‌তে পারে না সত্য, কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল উপায়, প্রথমেই মেঝের জল ছিটিয়ে দেওয়া। সেই জলটা অল্প শুকিয়ে গেলে ধুলো সব ভিজে থাকে, ওপরে উঠ্‌তে পারে না। তখন ঝাঁট দিলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। ঝাঁট দেবার সময় আঁচলটা সঙ্গেই থাকে ; সেটা সে-সময় নাক-মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে কাপড়ের ত' কোন ক্ষতিই হয় না, অথচ শরীরের পক্ষে উপকার হয়।

বাজার থেকে তরিতরকারী এলে একবার ধুয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। কত অস্থান কুস্থান, ময়লাগাদায় কি তরকারী জন্মায় কেউ তা' দেখ্‌তে যায় না। সেই জায়গার মাটি তরকারীর গায়ে লেগে থাক্‌তে পারে। তার-পর অপরিষ্কার পাত্রে বা ছেঁড়া কাপড়ের ওপর রেখে লোক সে-সব বাজারে বিক্রী করে। তরকারী কুটে একবার ধোয়া হয়, আগুনে সিদ্ধ হ'লে পরে তার অনেক দোষ কেটে যায়। কিন্তু যে সব ফল-মূল না রেঁধে খাওয়া হয়, সে-গুলির একটা উপায় আগে হ'তে করে রাখা ভাল। তরকারী, ফল-মূল ঘরে তুল্‌বার আগে একবার ধুয়ে নিলে ছোয়া-ল্যাপার জন্য কোন বিপদের ভয় থাকে না। তবে মন-বোঝান ধোয়াতে কাজ হয় না। অনেক সময় মেয়েরা বাজার থেকে আনা তরকারী-গুলোর ওপর দু'এক ফোঁটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। গঙ্গাজল যে খুব শুদ্ধ, তাতে আর ভুল নেই। তবে ছিটে ফোঁটায় বিশেষ ফল হয় না। একেবারে সবগুলোর ওপর ঘটি-কতক গঙ্গাজল ঢাল্‌তে পারলে আর কোন ভাবনার কারণ থাকে না। কিন্তু গঙ্গাজল এত সস্তা নয়। সুতরাং, পাতকুয়া বা ইদারার জল এক-আধ ঘড়া দিলে হানি কি? আমাদের বাংলা-দেশকে কবিরা সুজলা সুফলা বলেন্। এখানে যত ফল তত জল। আরব-দেশ বা রাজপুতানার মত এখানে জলের অভাব নেই। সুতরাং, এখানে ও-বিষয়ে কৃপণ না হওয়াই উচিত।

ধোপার-বাড়ী হ'তে কাপড়-চোপড় এলেও একবার অন্ততঃ জল-কাচা করে নেওয়া উচিত। যে কাপড় কাচে, সে সকল সময় ভাল জল পায় না, আর এত লোকের কাপড় তাকে কাচ্‌তে হয় যে, সব আলাদা করে পরিষ্কার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে যদি তেলের দাগ ও ময়লা সাফ্‌ করে দিতে

পারে তা' হলেই বুঝ্‌তে হ'বে চের হ'ল। কাচ্‌বার সময় কত রকম লোকের, কত রোগীর কাপড়-চোপড় এক সঙ্গেই কাচ্‌তে হয়। সময় সময় ধোপাবাড়ীর টাট্‌কা-কেরৎ কাপড় ব্যবহার করে দাদ, চুলকানি, পাঁচড়া আরও কত খারাপ রোগ হয়। সব বাড়ীতে এ রকম কাপড় গরম-জলে ফুটিয়ে নেবার উপায় থাকে না। আর থাক্‌লেও তা'র ইচ্ছা বা সময় হয় না। কিন্তু সে সব একবার জলকাচা করে নিতে সকলেই পারেন।

পাণের গায়ে জল লেগে থাকে বলে সকলে তা' ভাল করে ধোয়া দরকার, এ-কথা ভাবেন না। পাণের দোকানে মান্ধাতার আমলের জলের গামলা হ'তে জল নিয়ে পাণের ওপর ছিটান হয়। যদি দোকানীর পাণের সঙ্গে তামাকের ব্যবসা থাকে, তবে এক একবার তামাক বিক্রী করে পাণ বিক্রী করার সময় সেই গামলায় সে হাত ধুয়ে লয়। পাণের ওপর সময় সময় ছোট ছোট পোকা বা পোকার ডিম থাকে। এ-রকম পাণ ভাল করে না ধুয়ে চিবানো শরীরের পক্ষে খারাপ। তারপর পাণে চুণের শক্ত কুচি থাক্‌লে বা সুপারীর কুচি বা তা'র পাত্‌লা শক্ত খোসা থাক্‌লে, তা' পাণের সঙ্গে পেটে যায়। ও সব জিনিশ খেলে পাথ্‌রী হ'বার সম্ভাবনা। পাণ সাজার সময় এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। পাণ খেতে গিয়ে যেন প্রাণ না দিতে হয়।

শোক সংবাদ।

ভূতপূর্ব্ব বিচারক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী গত ৮ই জানুয়ারী রবিবার চারিটি পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমা কন্যা। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা দিয়াছিল এবং তিনি এই শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি-সাধনের ও এতদ্দেশীয় নরনারীর সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য "সঙ্গীত-সঙ্ঘ" স্থাপন করিয়া তিনি বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই 'সঙ্গীত-সংঘ' বিদ্যালয়ে তিনি বহু যত্নে বিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তাদিগকে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য তিনি 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় উদ্যমেই তাঁহার পতির সহানুভূতি, উৎসাহ ও সহায়তা চিরদিনই বর্ত্তমান ছিল। পিতৃগৃহে কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ে তিনি সরস্বতীর চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। এই বিষয় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। বেথুনবিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণের উৎসবের সময় তিনিই প্রথমে প্রকাশ্য সভায় গান করিয়া এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করেন। মৃত্যুকালে সন্তানগণের সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কেবল এক পুত্র বিদেশে ছিলেন বলিয়া আসিতে পারেন নাই।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সাতাশ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার উন্নতি ও চির-শান্তি বিধান করুন্।

রিপণ কলেজের প্রবীণ অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ইংরাজী ও সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে উচ্চ শিক্ষার যে ক্ষতি হইল, তাহার শীঘ্র পূরণ হইবে না। দেহের সমস্ত শক্তি ও প্রাণ-মন দিয়া আপন-হারা হইয়া তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এজন্ত তিনি ছাত্রগণের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। পরমেশ্বর তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের শোক দূর করুন এবং তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি বিধান করুন।

সরস্বতী-পূজা।

মাঘের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত হিন্দুই দেবী সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক হিন্দু-গৃহেই এই পূজা হয় বলিয়া ইহা অতিশয় আনন্দপ্রদ উৎসব। এই আনন্দ যিনি যতই উপভোগ করুন্ না কেন, বালকদিগের ন্যায় কেহই ইহার-আনন্দ-রস আস্বাদন করিতে পারেন না। কৃতী অকৃতী সকল ছাত্রেরই এই দিনে অপার আনন্দ। কারণ, এই দিন অনধ্যায়, লেখাপড়া নিষিদ্ধ;—কেবল আনন্দ সম্ভোগের ব্যবস্থা। যে বালকের পাঠে যত অমনোযোগিতা, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজায় তাহার তত উৎসাহ, তত মনোযোগ দেখা যায়। তাহারা ভাবে পুরোহিত-মহাশয়কে ডাকিয়া ঘটা করিয়া পূজা করিলেই তাহাদের অন্তরে সর্ব্ব-বিদ্যা প্রতিভাত হইবে। কিন্তু তাহাদিগের এই অবস্থা দেখিলে 'হার্‌কিউলিস্ ও শকটচালকের' সেই গল্পটীর কথা মনে পড়ে। কেবল পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া পূজা করিলেই পূজা সম্পূর্ণ হয় না—জীবন দিয়া, কার্য্য দিয়া পূজা করিতে হয়, তবে পূজার ফল ফলে। নতুবা লেখা-পড়ার ধার না ধারিয়া বাহ্য পূজার আড়ম্বর করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না।

সে যাহা হউক্, হিন্দুদিগের এই পূজা ঠিক কবে কোন্ সময় কাহার দ্বারা আরব্ধ হইল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা যে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ব্রহ্মখণ্ড, গণেশখণ্ড প্রভৃতিতে ইঁহার বিষয় অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে সরস্বত্যুপাখ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপে গুরুশাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া সূর্য্যের উপদেশে সরস্বতীর স্বস্তুতির দ্বারা সেই নষ্টজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী কালে আমাদের যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা বেদের মধ্যে তাহার প্রামাণ্য অন্বেষণ করি। সরস্বতীর ইতিহাস অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমরা মূর্ত্তি-পূজার ক্রমাভিব্যক্তিও দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে সকল দেবীর

পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী দেবীর নামই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে স্ত্রী-দেবতাদিগের স্থান নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ সকল দেবতাগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উষা এবং তৎপরেই সরস্বতী। ঋগ্বেদের তিনটী সম্পূর্ণ সূক্তে এবং অন্যান্য সূক্তের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে; কিন্তু এই সকল সূক্তে যে সরস্বতীর স্তব হইয়াছে সেই সরস্বতী ও বর্ত্তমান সময়ের সরস্বতী ঠিক্ এক কি-না বলা কঠিন। পূর্ব্বের সেই বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ এই সরস্বতী-শব্দের দ্বারা ঠিক কাহাকে বুঝিতেন তাহা এই শব্দটির প্রকৃতি এবং ঋগ্ মন্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে কতকটা বুঝা যায়। সেই যুগযুগ পূর্ব্বের আর্য্যগণ প্রকৃতির শিশু ছিলেন, সরলভাবে যাহা যেরূপ উপলব্ধি করিতেন, তাহাকে সেইরূপ সরলভাবেই প্রকাশ করিতেন। 'সরস' এই শব্দের অর্থ জল (সৃ-ধাতুর গমনরূপ অর্থ হইতে উৎপন্ন) এবং বৎ (মতুপ্) অর্থে 'যুক্ত' বা 'অধিকারী'; সুতরাং 'সরস্বৎ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত-জলবিশিষ্ট'। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী হইয়াছে। বাস্তবিক ঋগ্বেদে সরস্বান্ ও সরস্বতী দুইজনের স্তব আছে, যদিও মহামতি সায়ন সরস্বান্ অর্থে মধ্যস্থানস্থিত বায়ু এবং মধ্যস্থানস্থ জলবৰ্দ্ধ বাক্ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে প্রভূত-জলবিশিষ্ট (নদ বা নদী) রূপেই মনে করা যায়। এই জন্য নিরুক্তকার যাস্ক 'সরঃ' কে উদকপর্য্যায়ে এবং সরস্বতীকে নদী-পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে আছে।—

প্রক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ ॥ ১ ॥

অর্থাৎ—এই সরস্বতী লৌহনির্ম্মিতা পুরীর ন্যায় অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে ধারয়িত্রী হইয়া সকলের (প্রাণ-) ধারক উদকের সহিত প্রধাবিত হইতেছেন। তিনি অন্যান্য সমুদায় জলপ্রবাহকে নিজ মহত্ত্বের দ্বারা বাধা প্রদান করিয়া পথের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া গমন করিতেছেন। অথবা রথী যেরূপ মার্গস্থ তরুগুল্মাদিকে চূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়, তিনিও সেইরূপ সকলকে নিষ্পেষিত করিয়া বহিয়া যাইতেছেন।

'একাচেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ। রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ২ ॥

অর্থাৎ নদীগণের মধ্যে শুভ্রা, গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী (নদী) নাহুষের প্রার্থনা জানিয়াছিলেন এবং ভুবনের বহুবিধ ধন প্রদান করিতে করিতে নাহুষের জন্য দুগ্ধ ও ঘৃত দোহন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

৪র্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

মিতজ্ঞুভির্নমস্যমিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ।

অর্থাৎ নতজানু দেবগণ প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করে। তিনি নিত্যধন যুক্তা এবং সখাদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্ ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ "শুভ্রবর্ণে দেবি! বৰ্দ্ধিত হও, স্তবকারীকে অন্নদান কর।"

ঋষি বসিষ্ঠ আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।—

"বৃহদু গায়িষে বচোঽসুর্য্যা নদীনাং।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বসিষ্ঠ রোদসী ॥৯৬।১

অর্থাৎ (হে বসিষ্ঠ) তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান

কর; দ্যাবাপৃথিবীতে বর্ত্তমানা (অর্থাৎ 'আকাশে দেবতারূপে এবং ভূমিতে বাগ্‌রূপে স্থিতা'—সায়ন) সরস্বতীকে দোষবর্জ্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর।

উতে যস্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ন্তি পুরবঃ।
সা নো বোধ্যবিত্রী॥

অর্থাৎ হে শুভ্রবর্ণে (সরস্বতি) যে তোমার মহিমার দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ (দিব্য ও পার্থিব অন্ন অথবা গ্রাম্য ও আরণ্য) অন্ন প্রাপ্ত হয়, সেই তুমি আমাদিগের রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও (বা জ্ঞান দান কর।)

"যে তে সরস্ব ঊর্ম্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ। তেভির্নোঽবিতা ভব।৭।৯৬।৫।

অর্থাৎ সে সরস্বান্ দেব, তোমার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতক্ষারী, সেইজল-সমূহদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।"

ঋষিদিগের এই সকল স্তবস্তুতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সরস্বতী একটী অজেয় জলপ্রবাহ। কিন্তু এই সকল মন্ত্রের মধ্যে এমন সকল কথাও রহিয়াছে, যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা ইহাকে চেতনাবিহীন জল-প্রবাহ বলিয়া মনে করিতেন্ না। ইহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয়, অদৃশ্য দেবতার সাক্ষাৎ-কার যেন তাঁহারা পাইয়াছিলেন্। তিনি যে কেবল অন্নদাত্রী ও জলবাহিকা তাহা নহেন্, তিনি অন্নযুক্ত-যজ্ঞবিশিষ্টা, যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী (সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী ধিয়াবসুঃ—১।৩।১০), সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী (চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং), এবং সকল জ্ঞানের উদ্দীপয়িত্রী (ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি—১।৩।১২)। সরস্বতীর এই যে সকল গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার বাগ্‌দেবীত্বও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয়, মহামতি যাস্ক 'সরস্' ও 'সরস্বতী' শব্দ-দুইটীকে বাঙ্‌নামপর্য্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন্ এবং বলিয়াছেন্।—

"তত্র সরস্বতী ইত্যেতস্য নদীবদ্ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি॥" যাস্ক, নিরুক্ত, ২।২৩।৩।

অর্থাৎ যে ৫৭ টী বাঙ্‌নাম প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যস্থ সরস্বতী-শব্দ নদীকেও বুঝায় এবং দেবতাকেও বুঝায়। ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে সরস্বতী-শব্দের দ্বারা কাহাকে বুঝিতেন্ সে-বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে জলপ্রবাহ বুঝিতেন্ তাহার আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। বেদের মন্ত্রের দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা হয়, তিনিই দেবতা (যা তেন উচ্যতে সা দেবতা); সুতরাং নদীপ্রবাহ 'দেবতা' হইবেন কিরূপে, এরূপ বলা যায় না। পরন্তু নদীপ্রবাহও উক্ত হওয়ায় উহা দেবতা হইতে পারেন। তবে সরস্বতীর যে সকল গুণ ও শক্তির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা প্রবাহ-মাত্রের থাকা সম্ভব কি-না, তাহাই বিবেচ্য। চেতনাবিহীন প্রবাহে চৈতন্য-বিশিষ্টের ধর্ম্মারোপ কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই সর-স্বতীকে আমরা কখন কখন ইলা ও ভারতী-নাম্নী দুইটী স্ত্রীদেবতার সহিতও যুক্ত দেখিয়া থাকি। ইলা পৃথিবী, বাক্, অন্ন ও গোপার্য্যের অন্তর্গত। ভারতীও বাক্-পর্য্যায়ান্তর্গত। কিন্তু ১০ম মণ্ডলে ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্রে এই তিন জনকেই আহ্বান করা হইয়াছে। সে-স্থানে ভারতীর ব্যাখ্যা হইয়াছে 'ভরতঃ আদিত্যঃ,'

সর্ব্বভূতানি উদকেন বিভর্ত্তি, তস্য স্বভৃতা ভাঃ' অর্থাৎ সর্ব্বভূত জল-দ্বারা পূর্ণ করেন বলিয়া ভরত অর্থে আদিত্য, ভারতী তাঁহার স্বভৃতা ভাঃ অর্থাৎ দীপ্তিঃ॥

ঋগ্বেদে সরস্বতীর এই বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেও ব্রাহ্মণের যুগে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পুরাণের যুগে ইনি সর্ব্ব-বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, বেদশাস্ত্র-যোগমাতা বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা, শাস্ত্রজ্ঞান-বাগ্‌বিভবপ্রদা ব্রহ্মপত্নী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

সরস্বতী নদী কিরূপে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন, তাহা দেখা যাক্। সরস্বতী নদী হইলেও বৈদিক যুগে তাঁহাকে বহুযজ্ঞে আহ্বান করা হইয়াছে এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে বৈদিক-যুগের আর্য্য ঋষিগণ প্রত্যেক পার্থিব বস্তুর পশ্চাতে একটি অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করিতেন এবং তাহাকেই দেবতারূপে পূজা করিতেন। কিন্তু এই সরস্বতী নদী যে তাঁহাদিগের জীবন, চিন্তা, যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে সরস্বতী নদীর তীরে সম্পাদিত বহু যজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ তাঁহারা এই স্থান অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রকৃতির শোভা, নদ, নদী, পর্ব্বত, কান্তার, শস্যশ্যামল সুবিস্তৃত প্রান্তর দেখিলে চিন্তাশীল ভাবপ্রধান মানবের মনে কত অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয়, তাহা কে না জানে? আর্য্যঋষিগণ এই নদীর তীরে বসিয়া ইহার অপূর্ব্ব জলরাশির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ইহার উপকারিতা ও গুণে মুগ্ধ হইয়া কত গীত, কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইঁহাকেই সেই সকলের প্রেরয়িত্রী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঋত্বিক্ যখন এই নদীকে তাঁহার মন্ত্রাদির প্রধান কারণ বলিয়া ধারণা করিলেন, তখন তাঁহার শিষ্য, যজমান সকলেই সরস্বতীকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন। লোকের মুখে গায়ক-সম্প্রদায়ের গীতে সরস্বতীর মহিমা এইরূপে গীত হইতে লাগিল এবং অবশেষে সকলে তাঁহাকে বাগ্‌অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া মানিয়া লইলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মুইয়েরও এইরূপ মত।

যাঁহারা ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত তাঁহারা জানেন, প্রাচীন কালে প্রভূত জল-বিশিষ্ট নদনদীর তীরেই মানব দলবদ্ধভাবে বাস করিত এবং ক্রমে সেই সকল স্থান সুসমৃদ্ধ নগর-পল্লীতে পরিণত হইত। নীল-নদের তীরে মিশরী সভ্যতার ইউফ্রেটিস ও টায়গ্রিস্ নদীর তীরে ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার ক্রমোন্মেষে আমরা ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক্ ঐরূপ। বেদাধ্যয়নে দেখা যায়, সিন্ধু-সরস্বতী-তীরে বৈদিক আর্য্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশ হইয়াছিল। এই সরস্বতীর সাহায্যে আর্য্য অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার আদান-প্রদান করিতেন। সে-সময় কৃষিই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল এবং কৃত্রিম উপায়ে জল-সরবরাহ-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না পারায় তাঁহারা নদী-তীরেই তাঁহাদের কৃষিকার্য্য সম্পন্ন

করিতেন। নদীর প্রবাহ ও তাহার জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা পার্শ্বস্থ বিস্তৃত ভূভাগ যে উর্বর হইত তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ক্রীড়া-কৌতুকাদি সম্ভোগের জন্যও তাঁহারা নদী-তীরেই বাস করিতেন। সুতরাং কি ধর্ম্ম, কি সামাজিক জীবন, কি বাণিজ্য, কি জ্ঞানানুশীলন সমস্ত ব্যাপারই নদীর কৃপায় সুসম্পন্ন হইতে থাকায়, নদী তাঁহাদের জীবনে অতি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং ইহা তাঁহাদের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে সরস্বতী নদী হইলেও কিরূপে বিদ্যা, জ্ঞান ও কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। জ্ঞানের সহিত সরস্বতীর এই অভেদ-কল্পনা তাঁহাকে বাগ্দেবী করিয়া তুলিল।

মানবের যাহা কিছু জ্ঞান, যাহা কিছু বিদ্যা, যাহা কিছু শিষ্টাচার-সভ্যতা, যাহা কিছু অজ্ঞানতা দূর করিবার উপায়, সে সমস্তই সেই পরম পুরুষ,—মানুষ তাঁহাকে যে নামেই অভিহিত করুক না কেন—অপূর্ব্ব কৌশলে মানবের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিশ্ব তাঁহার সৃষ্টি, এই বিশ্ব প্রকৃতিতে তিনি ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার যাহা কিছু কার্য্য তাহা এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হয়, নিরবলম্বন হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে না, এবং পারিলেও জড়দেহধারী মানব তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু এ-সকল ক্রিয়াদ্বারাও সেই মহাপুরুষ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে না। মানুষ যখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইতে লাগিল, তখন এই অপূর্ব্ব দ্বিভাব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃতি পুরুষের কল্পনা করিয়াছে। বেদান্তে এই প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং তন্ত্রে ইঁহাকেই বিদ্যা বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে যে সকল সংজ্ঞাদ্বারা ইঁহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তন্মধ্যে সরস্বতী একটি।

সরস্বতীকে বহু নামে স্তব করা হইয়াছে। তিনি বিদ্যা, তিনি মহাবিদ্যা, তিনি বিশ্বরূপা, তিনি বাণী, তিনি হৃদয়-সংস্থিতা চেতনা, তিনি অক্ষরা, নিরবলম্বা, তিনি স্মৃতিশক্তি-জ্ঞান-শক্তি-বুদ্ধিশক্তি-স্বরূপিণী, তিনি প্রতিভা-কল্পনা-শক্তি-জ্যোতী-রূপা সনাতনী। ইহা হইতে দেখা যায় সরস্বতী পার্থিব বস্তু বা কোন বিশেষ মূর্ত্তি-বিশিষ্টা নহেন।

পৌরাণিক যুগে মানুষ জ্ঞানে উন্নত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছিল সাধারণ বুদ্ধি মানবের পক্ষে তাহার ধারণা করা কঠিন। জ্ঞান উপলব্ধি করিবার বিষয়, প্রকাশ করিবার নহে। ইহা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ও সৌন্দর্য্যময়। সাধারণ মানব যাহাতে ক্রমে ইহার নিকট উপনীত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আধুনিক সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির শুভ্র বর্ণ জ্ঞানের বিশুদ্ধত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব প্রকাশ করিতেছে, হস্ত-বিধৃত বীণা, পুস্তক, লেখনী ও পদ্মযুগল এবং আসনস্বরূপা শ্বেতাম্ভোজ সাহিত্য ও শিল্প বিজ্ঞানকে

ব্যক্ত করিতেছে। * শব্দ দুই প্রকার ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বীণার দ্বারা ও বর্ণাত্মক শব্দ পুস্তকের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। হস্তস্থিত বীণার দ্বারা ইহাও বুঝান হইয়াছে যে, জ্ঞান চিত্ত-তন্ত্রীতে অহর্নিশ স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য বস্তুও তাঁহার এক একটি গুণের প্রকাশক।

সরস্বতীর স্তোত্রে আছে—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা॥

—দেবীর আসন শ্বেতপদ্ম, তিনি শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, তাঁহার বস্ত্র শুভ্র, তাঁহার অঙ্গে শ্বেত গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত, তাঁহার বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, নেত্র শুভ্র, তিনি শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিতা এবং শ্বেতলঙ্কার-ভূষিতা। তাঁহার পূজোপচার দ্রব্য নবনীত, দধি, ক্ষীর, খৈ (লাজ), শুক্ল ধান্য, শুক্লবর্ণ-পক্ক-গুড়, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত শুভ্র হবিষ্যান্ন, যবগোধূম-চূর্ণ-নির্ম্মিত ঘৃত-সংস্কৃত শুভ্র পিষ্টক, শুভ্র পুষ্প—সমস্তই শুভ্র। তিনি স্বয়ং কুন্দেন্দু তুষার-হার-ধবলা। এরূপ সর্ব্ব-শুক্লা সরস্বতীর কল্পনা আর্য্যেতর জাতির পক্ষে অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য। রূপক বলিয়া আমরা যতই ব্যাখ্যা করি না কেন, এই শুভ্রত্ব যেন সেই আর্য্যাবর্ত্ত-প্রবাহিতা যজ্ঞধূমসমাচ্ছন্না শুভ্রা সরস্বতীরই স্মৃতি-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। নদীতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই ইঁহার রহিয়াছে। পদ্ম, হংস, কচ্ছপী (বীণা) এ সমস্তই জলের সহিত সম্বন্ধ। যদিও কচ্ছপী পরবর্ত্তি-কালে সরস্বতীর করস্থিত বীণার সংজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে একটি নিগূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে; এই তথ্য আমরা গ্রীক-পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাই। তথায় বলা হইয়াছে, দেবদূত হারমিস্ কচ্ছপের নাতিগভীর দৃঢ় দেহবর্ম্মের উপরে তন্ত্রী সংযোগ করিয়া বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। *

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। পদ্ম হইলেই যে তাহা শিল্পের পরিচায়ক হইবে, তাহা নহে। মানব তাহার যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করিতে চাহে তাহাকে অতিপবিত্র হৃৎপদ্মাসনে উপবেশন করায়। তাহা না হইলে তাহার তৃপ্তি হয় না—যেন পূজা অসম্পূর্ণ থাকে। সেই হৃৎপদ্মেরই প্রতিরূপক শ্বেতাব্জ।

* ভরহুতস্তূপ হইতে আনীত প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত বৃত্তাকার কারুকার্য্যময় চিত্রগুলি পদ্ম-ফুলেরই প্রতিচ্ছবি। সাঁচিস্তূপের পূর্বতোরণের স্তম্ভগুলির উপরও পদ্মের সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। অতিপ্রাচীনকাল হইতেই পদ্ম শিল্পীগণের একটি প্রিয় বস্তু এবং সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্দীপয়িত্রী। কবিগণ পদ্মের সৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ যে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়াই তাঁহারা কাব্যে বর্ণনীয় নদীতড়াগাদির সলিলমাত্রেই পদ্মাদি-বর্ণনের নিয়ম করিয়াছেন।

* হারমিস্ দেবদূত বলিয়া বাগ্মিতার অধিষ্ঠাতা দেবতা। তিনি বুদ্ধি-দেবতা, বীণা, বংশী, সঙ্গীত, কবিতা, জ্যোতিষ ও অক্ষরের সৃষ্টি কর্ত্তা। তাঁহার প্রিয় জীব-গণের মধ্যে কচ্ছপ একটি। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে খাদ্যোপহার দেওয়া হইত তাহার মধ্যে ধূপ ধুনা মধু ও পিষ্টক থাকিত। সরস্বতীর সহিত গ্রীক-দেবতা হারমিসের গুণের কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইনি পুরুষ উনি স্ত্রী। গ্রীকদিগের জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা (বা মিনার্ভা), দেবরাজ জিউসের কন্যা—তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূতা। সরস্বতীও এইরূপ পরমাত্মার মুখোদ্ভূতা। মিনার্ভাকে কেহ কেহ বংশীর আবিষ্কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গ্রীকদিগের দেবী আর্টিমিসের সহিত সরস্বতীর একটি সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই ললাটে নবচন্দ্রকলাধারিণী। আর্টিমিস সঙ্গীত-দেবতা অ্যাপোলোর যমজ-ভগিনী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 703. March, 1922.

"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ।	ফাল্গুন, ১৩২৮। মার্চ্চ, ১৯২২।	১২শ কল্প।
৭০৩ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

আবাহন।

এস আজি প্রিয়তম,
আদরে ঢালিব চরণে তোমার
প্রীতির অর্ঘ্য মম।
হের দূর বনে কুসুম-গন্ধে,
কোটি বিহগের মধুর ছন্দে—
আমারি হৃদয় নীরবে বন্দে
তোমারে জীবন-রম!
শত দিকে আজি হের স্নেহময়
পূজা-উপচার মম।

তুমি নয়নের তারা,
যাত্রা-শরণী জীবনে আমার
তোমারি আশিস্-ধারা।
সুখে দুঃখে দেব আলোকে আঁধারে
চরণের তলে রেখেছ আমারে,
তোমারি পুণ্য স্নেহ-সম্ভারে
বিলীন হয়েছি হারা।
এস প্রিয়তম, জীবনের সাথী,
নয়নের ধ্রুব তারা।

দীপ্ত আলোকে আজ—
চির সুন্দর দেবতা আমার
এস হৃদয়ের মাঝ!
বাসনার বীণা সুমধুর স্বরে
ঝঙ্কৃত আজি হৃদয়ের ঘরে,
মিনতি জানায় প্রণতি তোমারে
আদরে জীবন-রাজ!
এস বরণীয় দেবতা আমার
মলিন মর্ম্ম-মাঝ।

বিস্মৃতি-সাগর-নীরে
মরমের শত মলিন কামনা
ডুবে যাক্ ধীরে ধীরে।
উজল করিয়া অন্তর-ভূমি
শুধু প্রিয়তম জেগে থাক তুমি,
শত জনমের সাধনায় আমি
তোমারে রাখিব ঘিরে।
অন্তরতম, শুভাশিস্ ধারা
ঢালিও আমার শিরে।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

জন্ম-পত্রিকা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এখন ইহার জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

(জাতক-ঘটনা)

(১) পিতার মৃত্যু।—পিতৃকারক রবি শনিযুক্ত এবং পিতৃভাবে রবি ও শনি এই দুইটি অশুভ গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি বিদ্যমান থাকাতে ইঁহার বাল্যে পিতৃমরণ যোগ হইয়াছিল। পরন্তু পিতৃভাবাপেক্ষা দ্বিতীয়পতি চন্দ্র পিতার মহামারক এবং চন্দ্রের সম্বন্ধী মঙ্গলও মারক। পিতৃভাবাপেক্ষা অষ্টম-ভাবস্থ রাহুও মারক। অতএব বিংশোত্তরী মতে মঙ্গলের দশাতে রাহুর অন্তরে প্রায় ৮ম বর্ষ বয়সে পিতার নিধন।

(২) প্রতিভা ও বিদ্যানুশীলনে অসাধারণ অনুরাগ। অষ্টোত্তরী-মতে বুধের দশাতে জন্ম। বুধ লগ্ন- ও দশম-পতি, বিদ্যা-কারক বৃহস্পতিযুক্ত এবং স্বয়ং বিদ্যা-কারক। অতএব বাল্যকাল হইতেই প্রতিভা ও বিদ্যার্জ্জনে ইঁহার অসামান্য অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই এত গ্রন্থাদি পড়িয়াছিলেন যে, একজন কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রও এত গ্রন্থ পড়িয়াছিল কি-না সন্দেহ।

(৩) ধর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি অষ্টোত্তরী-মতে বুধের দশাতে জন্ম। বুধ ধর্ম্মভাবের পূর্ণদর্শী। প্রায় ষোল বৎসর বয়ঃক্রম-পর্য্যন্ত বুধের আধিপত্য ছিল। তাহার পর ভক্তি ও বিদ্যাভাবের অধিপতি শনির আধিপত্য আরম্ভ হয়। সুতরাং ছাত্রজীবনেই ১৪ কি ১৫ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ইঁহার ধর্ম্মের প্রতি আসক্তির উদ্ভাস হয়। ইনি সভা করিয়া সহপাঠীদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন; এই সময়ে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দিগের গ্রন্থাদি-পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

(৪) প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব-লাভ।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শনি বিদ্যাভাবাধিপতি। বৃহস্পতি বিদ্যাকারক এবং বিদ্যাকারক বুধযুক্ত। অতএব অষ্টোত্তরী-মতে শনির দশাতে বৃহস্পতির অন্তরে এবং বিংশোত্তরী-মতেও বৃহস্পতির অন্তরে প্রায় ১৮ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন ও কীর্ত্তি লাভ করেন। ভূতপূর্ব্ব হাই কোর্টের জজ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

(৫) কঠিন রোগ ও শয্যাগতাবস্থা।—রোগভাবাধিপতি শনি অস্তগত এবং ব্যয়াধিপতি রবি ও নিধনাধিপতি মঙ্গলের সম্বন্ধী হওয়াতে মারক ও কঠিন রোগ-কারক। রোগ-ভাবের ফলদাতা রাহুও রোগ-কারক। অতএব বিংশোত্তরী-মতে রাহুর দশাতে শনির অন্তরে ২০ হইতে ২২ বর্ষ বয়সের মধ্যে কঠিন পীড়া ও শয্যাগত অবস্থা হইয়াছিল।

(৬) এফ-এ পরীক্ষা।—বুধ বিদ্যাকারক ও শনি বিদ্যাভাবাধিপতি। অতএব অষ্টোত্তরী-

যাক শনির দশাতে বুধের অন্তরে এবং বিংশোত্তরী-মতে রাহুর দশাতে বুধের অন্তরে ২৪।২৫ বর্ষ বয়সে এফ, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ।

(৭) বিবাহ ও বি-এ পরীক্ষা।—শুক্র স্ত্রী-গ্রহ ও জায়া-কারক। বৃহস্পতি জায়াপেক্ষা জায়াভাবপতি। অতএব বিংশোত্তরী-মতে রাহুর দশাতে শুক্রের অন্তরে এবং অষ্টোত্তরী মতে বৃহস্পতির দশাতে নিজান্তরে ২৫ বর্ষ ৮ মাস বয়ঃক্রম হইতে ২৮ বর্ষ ৬ মাস বয়ঃক্রমের মধ্যে বিবাহ। শুক্র বিদ্যাভাবস্থ এবং বৃহস্পতি স্বয়ং বিদ্যা-কারক। অতএব এই সময়ের মধ্যে বি-এ পরীক্ষাতে কৃতকার্য্যতা লাভ।

(৮) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বৃহস্পতি অতীব শুভ এবং নানাগুণসমন্বিত। এই মহাত্মার জাতকে বৃহস্পতি সর্ব্ব-গ্রহাপেক্ষা বলবান্ ও শুভ। অতএব বৃহস্পতি ইঁহার জীবনের নায়ক গ্রহ (Ruling planet)। বৃহস্পতি ধর্ম্মভাবের পূর্ণদর্শী এবং স্বয়ং ধর্ম্ম, ভক্তি, ধন ও কর্ম্ম-কারক। এই বৃহস্পতির দশাতে বিংশোত্তরী-মতে ৩২ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর এবং অষ্টোত্তরী-মতে ২৬ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর হইতে প্রায় ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সকলের চরমোন্নতি লাভ হইয়াছিল। এই বৃহস্পতির দশাতেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মমতে বিবাহ এবং ব্রাহ্ম-সমাজে প্রকাশ্য ও প্রকৃষ্টরূপে প্রবেশ লাভ। এই বৃহস্পতির দশাতেই ভারতাশ্রমে স্থান-লাভ এবং ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম সোপানে আরোহণ। এই বৃহস্পতির দশাতেই হরিনাভিতে দেবদাত্তোর সংস্থাপন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা; এই বৃহস্পতির দশাতেই সিটি-কলেজের অধ্যক্ষ-পদপ্রাপ্তি; এই বৃহস্পতির দশাতেই ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃত্ব-লাভ এবং এই বৃহস্পতির দশাতেই অলোক-সামান্য ধর্ম্ম ও ভক্তির প্রচার-দ্বারা সুদূর-প্রসারিত কীর্ত্তি ও সম্মান এবং পূজা-লাভ। সংক্ষেপে এই মহাত্মার জীবনে যাহা কিছু মনোরম, মধুর, লোভাপম ও অলোকসামান্য তাহা সকলই এই বৃহস্পতির দশাতেই লব্ধ হইয়াছিল।

(৯) সন্তান-লাভ।—এই বৃহস্পতির দশাতে অষ্টোত্তরী মতে সন্তানভাবস্থ স্ত্রী-গ্রহ শুক্রের অন্তরে এবং বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতির নিজান্তরে ৩২।৩৩ বর্ষ বয়সে ভারতাশ্রমে প্রথমা কন্যার জন্ম হয়।

(১০) মাতৃ-নিধন।—মাতৃভাবাপেক্ষা দ্বিতীয় স্থানে রাহু অবস্থিত হওয়াতে রাহু মাতৃ-মারক। অতএব বিংশোত্তরী-মতে রাহুর দশাতে মাতৃভাবাপেক্ষা নিধনপতি চন্দ্রের অন্তরে এবং অষ্টোত্তরী-মতে রাহুর অন্তর্দশাতে ৩০।৩১ বর্ষ বয়সে মাতৃনিধন।

(১১) বিশেষ পীড়া।—বৃহস্পতি সপ্তম-পতি হওয়াতে বিশেষ মারক ও রোগ-কারক। অতএব বৃহস্পতির দশাতে উহার সম্বন্ধী বুধের এবং কেতুর অন্তরে ৩৬ বর্ষ হইতে ৪০ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিশেষ পীড়া।

(১২) এই মহাত্মার বৃহস্পতির দশা যেমন শুভ শনির দশা তেমনই অশুভ। বিংশোত্তরী মতে শনি ষষ্ঠপতি হইয়া ব্যয়পতি রবি ও অষ্টম পতি মঙ্গলের সম্বন্ধী হইয়াছে। অতএব শনি মহামারক। প্রমাণ,—

ব্যয়াধীশস্য সম্বন্ধী ভবেচ্চেৎ নিধনারকঃ। অপর সর্ব্বপাপশ্চ যৎ পেটৎ কুর্য্যাৎ তবে। ন শুভস্বদশাতাক

মরণং ভবতি ধ্রুবং॥ ধায়কেশ সম্বন্ধী যদি পাপঃ শনৈশ্চরঃ। মারকস্থ শনিৰ্জ্ঞেয়ো নাস্তমারক-লক্ষণম্॥
(ইতি পারাশরীয়ে)।

পারাশরীয়-ধৃত এই বচনানুসারে ব্যয়াধিপতি ও নিধনাধিপতির সম্বন্ধী অস্তগত, নীচনবাংশগতাদি-দোষযুক্ত শনি মহামারক। শাস্ত্রে অষ্টপ্রকার মৃত্যুর লক্ষণ উল্লিখিত আছে, যথা,—সাঙ্ঘাতিক পীড়া কিংবা মৃত্যু, ভয়, শোক, চৌর ও অগ্নিভয়, অপমান, নিন্দা, ধনহানি ও বন্ধন॥ শনির দশাতে এই মহাত্মার জীবনে এই অষ্টপ্রকার মৃত্যুই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। সেগুলি একে একে বিবৃত করিতেছি।

(ক)' বিংশোত্তরী মতে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে শনির দশায় আরম্ভ হয়। বুধ দশমপতি হওয়াতে সম্মান, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনিষ্টকর। মঙ্গল বন্ধু ও সুখ-ভাবের পূর্ণদর্শী হওয়াতে বন্ধু-সৌখ্য-সুখাদির অনিষ্টকর। এই সময় নিতান্ত বন্ধুলোকেরাও অল্পাধিক বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

(খ) সন্তানহানি ও স্ত্রী-মৃত্যু।—সন্তানভাবাধিপ শনি এবং শনি সন্তানভাবাপেক্ষা দ্বিতীয়ভাবেরও অধিপতি। অতএব শনি সন্তানদাতা ও সন্তানের সংহারকর্তা। আবার জায়াভাবাপেক্ষা শনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়পতি; সুতরাং শনি জায়ার মারক। শনি স্বীয় দশাতে শুক্রের অন্তরে আপন ফল সম্যগ্‌রূপে দান করিয়া থাকে। এই কারণে বিংশোত্তরী-মতে শনির দশাতে শুক্রের অন্তরে ৫৫ বর্ষ হইতে ৫৮ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে ৩টি সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু এবং অবশেষে স্ত্রীর নিধন-জনিত মহাশোক; পারিবারিক দুর্ভাবনাজনিত মনঃকষ্ট, ভয়, ইত্যাদি।

(গ) বি, এ-পরীক্ষার্থিনী তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু ও নিদারুণ বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শনি সন্তানের সংহার-কর্ত্তা। সন্তানভাবাপেক্ষা সপ্তমপতি চন্দ্র সন্তানের মারক। শনি মঙ্গলের সম্বন্ধী হওয়াতে মঙ্গলের অন্তরে স্বীয় ফল সম্যগ্‌রূপে দান করিয়াছে। অতএব বিংশোত্তরী-মতে শনির দশাতে চন্দ্রের অন্তরে তৃতীয়া কন্যার রোগের উৎপত্তি এবং মঙ্গলের অন্তরে (তাঁহার) ৬০।৬১ বৎসর বয়সে উহার মৃত্যু; এবং ৬১।৬২ বৎসর বয়সে এই অন্তর্দশাতেই স্বকীয় মারাত্মক বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি। ইহার পর কতিপয় বর্ষ ধরিয়া নানাপ্রকার গোলযোগ, অর্থহানি, অর্থকষ্ট, চৌরদ্বারা মূল্যবান্ দ্রব্যাদির অপহরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টপাত।

(ঘ) মৃত্যু।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি শনি মহামারক। সপ্তমপতি বৃহস্পতিও মহামারক। মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত লগ্নস্থ এবং নিধনাধিপতি। অতএব মঙ্গলও মারক। বিংশোত্তরী-মতে শনির দশাতে বৃহস্পতির অন্তরে এবং অষ্টোত্তরী মতে নিধনাধিপতির শত্রু শুক্রের দশাতে এবং মারক মঙ্গলের অন্তরে পূর্ব্বোক্ত বহুমূত্র রোগের ভয়ানক বৃদ্ধি এবং ৬৬ বর্ষ ৬ মাস বয়ঃক্রমকালে গত ৭ঠা আষাঢ় ১৯শে জুন (১৯০৭) বুধবার রাত্রি ১১টা ৫০ মিনিটের সময় স্বর্গারোহণ॥ এই সময়ে এই মহাত্মার মৃত্যুর বিষয় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

ইতিহাসে রমণী।

জার্ম্মেণীর সহিত ইংলণ্ডের সে-দিন ঐরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া গেলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজ ও জার্ম্মাণ-জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ এক ছিলেন। ভারতবর্ষে শেষ গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্বকালে যখন হূণগণ দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া লইতেছিল, সেই সময় জার্ম্মাণী হইতে য়্যাংগ্‌ল্‌স্ ও স্যাক্সন-জাতি বিলাতে গিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। সে আজ দেড় হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা। য়্যাংগ্‌ল্‌দের নাম অনুসারে দ্বীপের দক্ষিণ-ভাগের নাম ইংলণ্ড হইল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ব্রুটেন এবং অধিবাসীদের বৃটন বলা হইত।

ইটালী-দেশনিবাসী প্রাচীন রোমান জাতি য়্যাংগ্‌ল্‌দের আগমনের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বৃটনদের পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য জয় করিয়া লয়। দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে বৃটনদের একটি রাজ্য ছিল; সেখানকার রাজা রোমানদের বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আপনার দুই কন্যাকে ও বাকী অর্দ্ধাংশ রোমান্‌দগকে দান করিয়া যান। রাজার মৃত্যুর পর রোমান্‌গণ রাজকন্যা দুইটির অংশও আত্মসাৎ করিল। তাহাদের নীচতা এই-খানেই শেষ হইল না। রাণীকে তাহারা বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া কন্যা-দুইটিকে দারুণ অপমানে অপমানিত করিল। প্রতি-হিংসায় তীব্র জ্বালায় রাণী দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী বৃটনদিগকে একত্র করিয়া তিনি একটি বিরাটবাহিনী গঠিত করিলেন। যে আগুন তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছিল, তিনটি রোমান্ নগরী ধ্বংস করিয়া সত্তর হাজার নাগরিকের প্রাণ বধ করিয়াও তাহা নিভিল না। একটি রোমান্ বাহিনী প্রায় বিনষ্ট হইয়া গেল, পদাতিকেরা সকলেই মরিল, অশ্বারোহীর দল পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। এখানে রমণীর রণরঙ্গিনী চামুণ্ডার মূর্ত্তি—রমণী এখানে 'রণদা সর্বনাশী।'

অবশেষে রোমান্ শাসনকর্ত্তা স্বয়ং আসিলেন। রাণী গড়মণ্ডলের বীরনারী দুর্গাবতীর ন্যায় রণসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধরথ হইতে জ্বালাময়ী ভাষায় সেনাগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কন্যা তাঁহার সহিত ছিলেন। যুদ্ধ দেখিবার জন্য দলে দলে বৃটন-নারী শকটে বসিয়া পশ্চাতে অপেক্ষা করিতেছিল। যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও রাণীর সৈন্য পরাজিত হইল। রাণী ও তাঁহার দুই কন্যা বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন; কারণ, তাঁহারা জানিতেন রোমান্‌দগের হস্তে পতিত হওয়ার অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ।* আশীহাজার বৃটন সে যুদ্ধে নিহত হয়; দর্শকরূপে যে বৃটন রমণীগণ উপস্থিত ছিল, তাহারাও রক্ষা পায় নাই।

---

* রাণীর নাম ছিল বিদিগ্ বা বুদিকা; রোমীণরা তাঁহাকে বোডিসিয়া বলিত। ইংরাজ-কবি কুপার বোডিসিয়ার জীবন-কাহিনী-সম্বন্ধে যে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন, ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকবালিকা-গণের নিকট তাহা অপরিচিত নহে। কবি টেনিসনও বোডিসিয়ার উপর এক কবিতা লিখিয়াছেন। বৃটন-দিগের ভাষায় 'বুদিকা'-অর্থে জয়যুক্তা।

কয়েক বৎসর হইল রাণার উন্নত প্রস্তর-মূর্ত্তি লণ্ডনে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ম্মাহস্তে দীর্ঘদেহা রাণী যুদ্ধ-রথের উপর দাঁড়াইয়া; কঠিন নয়নে ঘোর প্রতিজ্ঞার চিহ্ন অঙ্কিত; রাণী প্রতিমার দুই পার্শ্বে দুই দুহিতা নতজানু হইয়া উপবিষ্টা—যুদ্ধাশ্ব-দুইটি নাসা বিস্ফারিত করিয়া সম্মুখ-বিক্ষিপ্ত পদদ্বারা বায়ুর স্তর বিদীর্ণ করিতেছে। যে নগর দূর অতীতে একদিন নারীর ক্রোধানলে রাক্ষসরাজ রাবণের স্বর্ণ-লঙ্কার ন্যায় পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল, তাহারই অধিবাসী প্রায় দুইহাজার বৎসর পরে সেই ক্রুদ্ধা যোদ্ধ-রমণীর প্রতিমূর্ত্তি বক্ষে রাখিয়া ধন্য হইয়াছে।

কালের চক্রে রোমানদের বিপুল রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল। জার্ম্মাণী হইতে অ্যাংগ্লো-সাক্সন জাতি আসিয়া বৃটেন অধিকার করিয়া বৃটন-জাতির নাম প্রায় লুপ্ত করিয়া দিল। ইহাদের যুগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা অ্যাল্‌ফ্রেড্। অ্যালফ্রেডের কীর্ত্তি-গরিমায় ইংলণ্ডের প্রাচীন গগন উদ্ভাসিত। এই গৌরবের ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছিল তাঁহার জননী-অঙ্কে। অ্যাল্‌ফ্রেডের মাতা একদিন তাঁহাকে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগকে একখানি সুরঞ্জিত কবিতা-পুস্তক দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে সকলের আগে এই বই পড়িতে পারিবে, তাহাকেই ইহা দিব।"* বালক অ্যালফ্রেড্ যত্ন করিয়া এক পুরোহিতের নিকট পড়িতে শিখিলেন এবং সেই পুস্তক জননীর সম্মুখে পড়িয়া তাহা লাভ করিলেন। অ্যালফ্রেড্ বীরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই বীররক্ত তাঁহার দেহে ছিল বলিয়া তিনি জন্মভূমি শত্রু দিনেমারদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আর তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ হইয়া অন্ধকার দেশে যে বিদ্যার আলোক বিতরণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা জননী-দত্ত শিক্ষার গুণে। অ্যালফ্রেডের জননী আদর্শ রমণী, সেইজন্যই তিনি দেবী।

অ্যাল্‌ফ্রেডের কন্যা পিতার অনেকগুলি গুণ পাইয়াছিলেন। অ্যাল্‌ফ্রেডের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্র ইংলণ্ডের রাজা হইলেন, তিনি ভগিনীর নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য না পাইলে বিপদ্ ঘটিত। অ্যাল্‌ফ্রেডের কন্যার সহিত ইংলণ্ডের মধ্যপ্রদেশের শাসন-কর্ত্তার বিবাহ হইয়াছিল; স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব্বাংশ তখন দিনেমারদিগের অধীনে। পিতা অ্যালফ্রেড্ যে কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, ভাই-ভগিনীতে মিলিয়া তাহা সম্পাদন করিলেন। অ্যাংগ্লো-স্যাক্‌সন-গণ যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন তাহারা রোমান্‌গণ-নির্ম্মিত দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; এবং আপনারাও নূতন দুর্গ বেশী নির্ম্মাণ করে নাই। অ্যাল্‌ফ্রেড্ দিনেমারগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় দুর্গের অভাব বড়ই বোধ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি নগরের প্রাচীর সংস্কার করেন এবং তাঁহার সামন্তগণকে দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতে বলেন; কিন্তু তাঁহারা আদেশ পালন করেন নাই। তাঁহার কন্যা তিনবৎসরে আটটি দুর্গ-নির্ম্মাণ

* ঐতিহাসিকগণ বলেন, অ্যাল্‌ফ্রেডের অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়; সুতরাং এই রমণী সম্ভবতঃ তাঁহার বিমাতা। যে রমণী বিমাতা হইয়া এরূপ উদারতার পরিচয় দেন, তাঁহার চরিত্র অতিমহৎ সন্দেহ নাই।

করিলেন। অ্যাল্‌ফ্রেড্‌-দুহিতা রমণী হইলেও বুঝিয়াছিলেন, যে সৈন্যচালনা করিয়া এ-সংগ্রামে নিষ্পত্তি হইবে না—দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়া দিনেমার-গণের গতিরোধ করিতে হইবে এবং অবরোধ করিয়া তাহাদের সুরক্ষিত নগর-গুলি অধিকার করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যের এক সীমান্ত হইতে ও তিনি স্বয়ং অন্তসীমান্ত হইতে দুর্গ-নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুর্গের মালা গাঁথা শেষ হইলে উভয়ে দিনেমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিলেন। ভগিনী রাজ্যের পশ্চিম-দিকে দেশের আদিম অধিবাসী বৃটনদিগকে পরাজিত করিয়া দমনে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন; তারপর নিজের সমস্ত বল একত্র করিয়া শত্রুর একটি প্রধান নগরীর উপর নিপতিত হইলেন। শত্রু রাজ্যের অন্তদিক্‌ আক্রমণ করিয়া তাঁহার মনোযোগ সেই দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু সফলকাম হইল না। রুষ্টা ব্যাঘ্রী এত সহজে তাহার ভক্ষ্য ত্যাগ করে না। সে নগর জয় করিয়াই তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে দক্ষিণে আসিয়া আর একটি নগর অধিকার করিয়া লইলেন। শত্রুর অধিকৃত সমুদায় জনপদগুলির জয়কার্য্য তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এখানে রমণী রাণী—এক হস্তে বরাভয়, অপর হস্তে প্রহরণ—শৌর্য্য ও প্রজ্ঞামিশ্রিত অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি।

অ্যাল্‌ফ্রেডের প্রপৌত্র যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন দেশে পুরোহিতের প্রাধান্য বাড়িয়াছিল। একজন ধর্ম্মযাজক দেশের প্রধান মন্ত্রী। রাজা উচ্চবংশীয়া এক রমণীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার বাসনা করিলেন। মন্ত্রী ও অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণের এ বিবাহে আপত্তি ছিল। যে-দিন রাজার অভিষেক-উৎসব হইতেছিল, তিনি প্রণয়িনীকে দেখিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রী ও দেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী রাজা ও রাজ-প্রণয়িনীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া রাজাকে বাহিরে সভায় টানিয়া আনিলেন। রাজা এ অপমান নীরবে সহ্য করিলেন না। মন্ত্রী বিতাড়িত হইয়া বিদেশে পলাইলেন। রাজা প্রণয়িনীকে বিবাহ করিলেন। পুরোহিতের দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং দেশের একাংশের অশিক্ষিত ও অসন্তুষ্ট অধিবাসিগণকে উত্তে-জিত করিতে লাগিল। ফলে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহীরা রাজাভ্রাতাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। প্রধান ধর্ম্ম-যাজক রাণীকে রাজার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং কথিত আছে, তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার অনুচরগণ উত্তপ্ত লৌহের দ্বারা রাণীর সুন্দর মুখ দগ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে সমুদ্রের পর পারে রাখিয়া আসিল।

ধর্ম্মযাজক ভাবিয়াছিলেন, যে সৌন্দর্য্যে রাণী রাজাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাহা নষ্ট করিয়া দিবেন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটাইবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল না। রাণী রাজার সহিত মিলিত হইবার আশায় আবার দেশে আসিলেন। তখন তাঁহার মুখের ক্ষত-চিহ্ন মিলাইয়া গিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর দেখা

হইল না। রাণী প্রধান ধর্ম্ম-যাজকের অনুচরগণের হস্তে ধরা পড়িলেন। শত্রুরা দেখিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। দুইজনকে পৃথক্ করিবার এক শেষ উপায় ছিল; সে উপায় মৃত্যু। নিষ্ঠুরের দল রাণীর পায়ের শিরা কাটিয়া দিল। কয়েক দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া রাণী মরিলেন। রাজাও বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। মিলন তাঁহারা জীবনে ভোগ করিতে পারিলেন না; মরণে তাহা পাইলেন। এখানে রমণী প্রণয়িনী, সুতরাং একাধারে হতভাগিনী ও সৌভাগ্যের রাণী।

রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতাই সমস্ত ইংলণ্ডের অধিপতি হইলেন। ইহার নাম এড্গার। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি একদিন শুনিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক পরমসুন্দরী স্ত্রীলোক আছে। এড্গার তাঁহার এক বন্ধুকে এই সংবাদ সত্য কি-না জানিতে পাঠাইলেন। সে রূপের বাস্তবিকই তুলনা ছিল না। বন্ধু রূপ-মহিমা দেখিয়া আত্মহারা হইলেন এবং রাজার আদেশ ভুলিয়া গিয়া নিজেই সে রমণীকে বিবাহ করিলেন। তিনি রাজাকে গিয়া বলিলেন যে, সে রমণীর রাণী হইবার মত সৌন্দর্য্য নাই। তিনি একথাও জানাইলেন যে, তাঁহাকে তিনি নিজেই বিবাহ করিয়াছেন।

প্রতারণার কথা প্রকাশ হইল। রাজা একদিন তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, তিনি তাঁহার আবাস-গৃহে যাইবেন। বন্ধুর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পত্নীর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া অনুনয় করিলেন, পত্নী যেন সেই দিনের জন্য আপনার অসামান্য রূপরাশি লুকাইবার চেষ্টা করেন। অনুনয়ের ফল হইল বিপরীত। স্বামী তাঁহাকে রাণী হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বামীর সর্ব্বনাশ করিবার সংকল্প করিলেন। এড্গার আসিয়া দেখিলেন সালঙ্কারা সুবেশভূষিতা অনুপমা রমণী-মূর্ত্তি। লোভ হইতে পাপের ব্যবধান বড় বেশী নহে; নৃপতির ইচ্ছা সকল সময় ন্যায় ও ধর্ম্মের বন্ধন মানে না। এড্গার শিকার করিবার ছলে বন্ধুকে বনে লইয়া গিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে লাভ করিবার জন্য সেনাপতি শের আফগানের প্রাণ-নাশে কুণ্ঠিত হন নাই। বন্ধু-পত্নীকে লাভ করিবার জন্য বন্ধুর প্রাণ-সংহারে এড্গারও কুণ্ঠিত হইলেন না। তবে এই বিশ্বাস-হন্তা বন্ধু হইতে শেরের আসন যত উচ্চে, এই রমণী হইতে নূরজাহানের আসনও সেইরূপ উচ্চে। চরিত্র-হিসাবে এই দুই বিভিন্ন দেশের রমণীর মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ব্যবধান রহিয়াছে।

যদি এড্গার আপনার বাসনা সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেন, দেশের পক্ষে মঙ্গল হইত। তিনি ইচ্ছা করিয়া কাল-সর্পীকে অঙ্কলক্ষ্মী করিলেন। মাতাপিতার পাপের ফল সকল সময় যে মাতাপিতাকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা নহে। কখন কখন নিরপরাধ পুত্র-কন্যাকেও তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মৃগয়া করিতে গিয়া এড্গার বন্ধুর প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন। শিকার হইতে ফিরিবার সময় এড্গারের পুত্র এডোয়ার্ডের প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

এড্গারের মৃত্যুর পর এডোয়ার্ড রাজা

হইয়াছিলেন। যে রমণীর জন্য এডগার পাপাচরণ করিয়াছিলেন, তিনি এডোয়ার্ডের বিমাতা। নিজ-পুত্র সিংহাসনে বসিতে পাইল না বলিয়া রাণীর ক্রোধ হইয়াছিল। অযোধ্যার রাণী কৈকেয়ী সপত্নী-পুত্র রামকে চৌদ্দ বৎসর বনে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এডোয়ার্ডের বিমাতা তাঁহার প্রাণ-হনন না করিয়া তৃপ্ত হইলেন না। আপন পুত্রের প্রতি অন্ধ-স্নেহ-প্রদর্শন মানবীর পক্ষে এতই সুলভ, আর পরের ছেলের উপর সেই ভালবাসা দেখান তাহার পক্ষে এতই কঠিন!

এডোয়ার্ড বিমাতাকে অনেক ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছিলেন। বিমাতা কিন্তু প্রসন্না হইলেন না। একদিন রাজা ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মৃগয়া হইতে ফিরিলেন। নিকটেই তাঁহার বিমাতার দুর্গ ছিল, সেখানে গিয়া যুবক পানীয় চাহিলেন। যখন পান-পাত্র হস্তে লইয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া তৃষ্ণা-দূর করিতেছিলেন, সেই সময় বিমাতার ইঙ্গিতে একটি ভৃত্য পশ্চাৎ হইতে তাঁহার দেহে অস্ত্রাঘাত করিল। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। *

হতভাগ্য যুবকের মৃত্যুর পরও রমণীর শত্রুতা দূর হইলনা। যুবককে সাধারণ লোকের ন্যায় কবর দেওয়া হইল। রাজার মৃত্যুর পর যেরূপ সমারোহ করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, তাহার কিছুই হইল না, এমন কি গীর্জ্জার সংলগ্ন ভূমিতেও তাঁহার দেহ শেষ আশ্রয়স্থান পাইল না। এখানে রমণীর হৃদয়ে রাক্ষসী ক্ষুধা, রমণী এখানে হিংসা-নিষ্ঠুরতার অধিষ্ঠাত্রী—দানবী।

কালে রাণীর অনুশোচনা হইয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। যে পুত্রের জন্য তিনি এত বড় পাপ কাজ নির্ব্বিকার মনে করিয়া গেলেন, তাঁর নাম এথেলরেড্। এই এথেলরেডের ন্যায় নিষ্ঠুর অকর্ম্মণ্য কাপুরুষ স্যাক্সনদের বংশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। সে আজ প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশ গজনীর সুলতান মহামুদের দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছিল। তখন ইংলণ্ড আক্রমণ করিতেছিল দিনেমারগণ। শত্রুর আক্রমণে দেশ উৎসন্ন হইল। এথেলরেড রাজ্য-ত্যাগ করিয়া বিদেশে পলায়ন করিয়া আপনার ঘৃণিত প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎযুগের মানবের ঘৃণা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

এথেলরেডের পুত্রের রাজত্ব-কালে আবার একটি রমণীর মাতৃমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। সে রমণী রাজ-বংশীয়া নহেন; তিনি রাজ্যের একজন প্রধান সামন্তের স্ত্রী গডিভা। তাঁহার স্বামী আপনার অধীন কভেণ্ট্রি নগরের উপর গুরুতর কর স্থাপন করিয়াছিলেন। নগরবাসিগণের সাধ্য ছিল না যে, সে কর প্রদান করে। সামন্ত-পত্নী গডিভা গুরু কর-ভার হইতে প্রজাবর্গকে মুক্তি দিবার জন্য স্বামীকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামী অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যদি তুমি নগ্নদেহে প্রকাশ্য দিবা-লোকে নগরের

---

* রাণীর বিবাহ-কাহিনী ও তাঁহার অনুচর-কর্তৃক সপত্নী-পুত্রের হত্যা এই দুইটি সত্য কি-না সে বিষয়ে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ করেন। সত্য না হইলেই মঙ্গল। তবে এটি সত্য যে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আকাশে তাঁহার প্রভাব সে সময়ে ধূমকেতুর ন্যায় অমঙ্গলপ্রদ ছিল।

উন্মুক্ত রাজ-পথ দিয়া গমন করিতে পার, তবেই নগরবাসী মার্জ্জনা পাইবে, নচেৎ নহে। গডিভা স্বীকৃতা হইলেন। নিরপরাধা নারী নগরের অপরাধ-ভার আপন মস্তকে লইয়া সেই নির্লজ্জ কঠোর সর্ত্ত পালন করিলেন। সে-দিন প্রভাতে নগরের অধিবাসী সকলে গবাক্ষ ও গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া কক্ষ-মধ্যে বসিয়া রহিল। জনপ্রবাদ, একজন পরিচ্ছদ-নির্ম্মাতা গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া সে-দৃশ্য দেখিয়া অন্ধ হইয়াছিল। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি স্বর্গের দেবীকে স্নান করিতে দেখিয়াছিল বলিয়া চক্ষুর দৃষ্টি হারাইয়াছিল। কভেণ্ট্রিতে দেবতার রোষে পাপী দৃষ্টিশক্তি-হীন হইল কিংবা ক্রোধোন্মত্ত নগরবাসীর দল তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিল, সে কথা জানিবার উপায় নাই; তবে শাস্তি যে উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়।

সামন্ত-পত্নী গডিভার কীর্ত্তি-স্মরণার্থ কভেণ্ট্রি নগরে মেলা-উৎসব হইয়া থাকে। গডিভা আদর্শ-জননী। তাঁহার প্রাণ সন্তানতুল্য প্রজাগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়াছিল। সেই দুঃখ-ব্যথায় তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা চলিয়া গিয়াছিল; কেবল জাগিতেছিল অসীম স্নেহ-দৌর্ব্বল্য আর হৃদয়-ভরা স্বর্গীয় করুণা। সে দৌর্ব্বল্যে ও সে করুণায় মানবী দেবী হইয়া উঠে। *

কভেণ্ট্রি নগরে গডিভা নিজব্যয়ে একটি মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতেন, ইহাই তা'র একমাত্র নিদর্শন নহে। অনেক মঠে তিনি অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। কয়েকজন নিঃস্ব ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তিনি লইয়াছিলেন। প্রার্থনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। ইংলণ্ডের স্যাক্সনযুগের অবসানকালে শেষ আরতির পঞ্চপ্রদীপের ন্যায় গডিভার চরিত্র একটি শান্ত পবিত্র আলোক বিকীরণ করিতেছে।

কভেণ্ট্রি-আখ্যায়িকার কয়েক বৎসর পরে শেষ স্যাক্সনরাজ হারল্ডের সহিত ইংলণ্ডে স্যাক্সন-প্রাধান্য লোপ পাইল। সঙ্কিণের রক্তসিক্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হারল্ড নিহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। প্রণয়িনী এডিথ্ বহু অন্বেষণের পর প্রণয়ীর শব পাইলেন। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত ও বদন বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি এডিথ্ সেই আঘাত-জর্জ্জর মৃতদেহ হারল্ডের বলিয়া চিনিতে পারিলেন।* বিজয়ী নর্ম্যান্-বীরের আজ্ঞায় দেহ সমুদ্র-তীরে সমাহিত হইল। যে সাগর-মেখলা সুন্দর স্বদেশকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হারল্ড প্রাণ দিলেন, তাহারই অঙ্কে চিরসুপ্তিঘোরে মগ্ন রহিয়া তিনি সেই সাগরের গভীর কল্লোল শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

---

* ইংরাজ সাহিত্যিক ল্যাণ্ডর-প্রণীত 'ইমেজিনারী কন্‌ভারসেসনস্‌'-(কাল্পনিক কথোপকথন) এ গডিভা-চরিত্রের একটি সুন্দর চিত্র আছে। ঔপন্যাসিক কিংসলে-প্রণীত 'হিয়ারওয়ার্ড দি ওয়েক'-নামক উপন্যাসে গডিভার উল্লেখ আছে;—তখন গডিভার মাতৃমূর্ত্তি। কবি টেনিসন্ ও কভেণ্ট্রী-আখ্যানের উপর একটী কবিতা লিখিয়াছেন।

* ভারত-লাট লিটনের পিতা ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন-প্রণীত শেষ স্যাক্সনরাজ হারল্ড-নামক উপন্যাসে মরালগ্রীবা সুন্দরী এডিথের কাহিনী বর্ণিত আছে।